দ্য লস্ট কিং

রাফায়েল সাবাতিনি

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এক

ফরাসি বিপ্লবের পরের কথা। ঘোর দুর্দিন তখন রাজপরিবারের। রাজা লুই, রানী মেরি অ্যান্টোইনেট, রাজপুত্র লুই চার্লস ও রাজকন্যা মেরি থেরেসকে 'টেম্পল' নামের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে বিপ্লবীরা।

টেম্পল কারাগারে চরম দুর্দশার মধ্যে চার চারটি বছর পার করলেন রাজা। শেষমেশ সমস্ত অপমানের অবসান হলো। গিলোটিনে কাটা পড়ল রাজমস্তক।

এবার রানীর পালা। তাঁকেও কিভাবে একই কায়দায় বিদায় করা যায় সেই ভাবনা-চিন্তা চলছে বিপ্লবীদের মগজে। এদের নেতৃত্বে রয়েছেন রোবেসপিয়ের–কট্টর এক বিপ্লবী। রানীর মাথা নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি। কিন্তু চাইলেই কি হয়?

পুরানো অনেক আইন-কানুন এ আমলে বাতিল হয়ে গেলেও চালু হয়েছে নতুন নতুন কিছু বিধি-বিধান। তার একটি হলো, কাউকে বিনা বিচারে সাজা দেয়া যাবে না।

বিচার অবশ্য রাজারও হয়েছিল। তবে তাঁকে শাস্তি দিতে বেগ পেতে হয়নি। কেননা, প্রজা স্বার্থবিরোধী কাজ তো কিছু কম করেননি তিনি!

কিন্তু রানীর ব্যাপারটা আলাদা। শাসন কাজে তাঁর হাত ছিল না। ফলে, তাঁকে চরম শাস্তি দিতে হলে একটা অজুহাত তো খাড়া করা চাই।

'কমিটি অভ পাবলিক সেফটি' অর্থাৎ জননিরাপত্তা সমিতি সাফ জানিয়ে দিল, রানীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া চলে না।

কিন্তু চলে না বললেই হলো? রোবেসপিয়ের আছেন কি করতে। 'উপায় বের করছি। প্রয়োজনে উপায় তৈরি করব।' বলে পাঠালেন তিনি।

টেম্পলের কারাগারপ্রধানের নাম শমেত। তাঁকে বিশেষ দিকনির্দেশনা পাঠালেন রোবেসপিয়ের। আর তিনিও একান্ত বাধ্যগতের মত নেমে পড়লেন হুকুম তামিল করতে।

www.doridro.com

কারাগারের তিনতলায় একসঙ্গে রাখা হয়েছে রানী, রাজকন্যা ও রাজভগ্নী এলিজাবেথকে। কিন্তু রাজপুত্র ডফিন লুই চার্লসকে রাখা হয়েছে দোতলায়

আলাদা জায়গায়। শিশু রাজপুত্রের অভিভাবকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সাইমন দম্পতির ওপরে। এরা স্বামী-স্ত্রী খাঁটি বিপ্লবী, শমেত পূর্ণ আস্থা রাখেন এদের ওপর। রোবেসপিয়েরের নির্দেশ হুবহু পালন করতে শুরু করল ওরা।

রাজপুত্রের যখন চার বছর বয়স তখন টেম্পল কারাগারে ঢুকেছে। প্রথম দু'বছর মা-বোনের কাছে ছিল। তারপর থেকে একদম আলাদা। চোখের দেখাও দেখতে পায়নি আর। বাচ্চা মানুষ, ব্যথায় গুমরে মরে, মাকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু বিপ্লবীরা তো সে সুযোগ রাখেনি। ডফিনকে বাগে আনবার হুকুম জারি হয়েছে সাইমন দম্পতির ওপর।

বেচারীকে বশ করতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দু'রকম কায়দা বেছে নিল। অতটুকু বাচ্চাকে কড়া ব্র্যান্ডি পান করাতে শুরু করল সাইমন। ডফিন খেতে না চাইলেও জোর করে গেলায়। মদ পান করে বেচারী হুঁশ হারিয়ে ফেলে। আর হুঁশ যখন ফেরে, ঘোর কাটে না। সাইমন যা বলে, বিনাবাক্যব্যয়ে তাই-ই মেনে নেয়।

'তুমি সেদিন ঠিক এরকমটাই দেখেছিলে না?' সাইমন জিজ্ঞেস করে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয় অবুঝ শিশু।

'হ্যাঁ, এরকমই তো দেখেছিলাম।'

ওদিকে সাইমনের স্ত্রী নিয়েছে ভিন্ন কৌশল। সে মাতৃস্নেহের ভান করে। আর মাতৃবিচ্ছিন্ন রাজপুত্র ডফিন সেটাকেই ভেবে নেয় অকপট ভালবাসা। মন খারাপ হলেই সে মহিলার কাছে আশ্রয় খোঁজে। আর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কী মধুর কণ্ঠেই না আওড়ায় ধূর্ত নারী, 'সেই রাক্ষসী মেয়েলোকটা, মানে তোমার মাকে তো এ কাজই করতে দেখেছিলে তুমি, তাই না?'

'তাই হবে, তুমি যখন বলছ,' নির্দ্বিধায় সম্মতি দেয় বালক।

মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে রাজপুত্রকে। অনেক কঠিন কঠিন কথা শেখানো হচ্ছে। এসব কথার অর্থ সে বোঝে না। কিন্তু না বুঝলেও, জননিরাপত্তা সমিতির সামনে দাঁড়িয়ে যদি মুখ ফুটে একবার বলে ফেলে, তবে তার মা মেরী অ্যান্টোইনেটের প্রাণদণ্ড ঠেকায় কার সাধ্য।

রাজতন্ত্র নেই। কিন্তু রানীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা রাজবংশের পবিত্রতা নষ্ট করার অভিযোগ আনল। তিনি নাকি চরিত্রহীনা, রাজসিংহাসনকে কলুষিত করেছেন। সে যুগে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রানী এবার যাবেন কোথায়?

ওদিকে পাখিপড়া করে শেখানো হচ্ছে রাজপুত্র লুই চার্লসকে। দিনের পর দিন চলছে এভাবে। স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে সে ক্রমাগত ব্র্যান্ডি পান করানোর ফলে। মাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যা যা প্রয়োজন তার কোন কিছুই

শিখতে বাকি রাখেনি ও।

অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। জননিরাপত্তা সমিতির সভা বসল টেম্পল কারাগারের এক বড়সড় কামরায়। সভ্যরা লুই চার্লসের জবানবন্দী শুনবার অপেক্ষায় বসা। শুনবেন তো বটেই, লিখেও নেবেন।

রাজপুত্রকে সভায় হাজির করা হলো। সাইমন দম্পতি রয়েছে তার সঙ্গে। গদি আঁটা আসনে ছেলেটিকে আয়েশ করে বসানো হয়েছে, আর তার কাঁধের দু'পাশ থেকে ঝুঁকে রয়েছে সাইমন ও তার স্ত্রী।

সাক্ষীকে জেরা করবেন লেব্রান। নয়া সরকারের আইনমন্ত্রী। বলাবাহুল্য, সেসব প্রশ্নই তিনি করবেন যেগুলোর উত্তর গত ক'মাস ধরে রাজপুত্রকে মুখস্ত করানো হয়েছে। রাজপুত্র লেব্রানের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে। আর কালক্ষেপণ না করে লিপিকাররা তড়িঘড়ি হাত চালিয়ে যাচ্ছে।

সদস্যরা একাগ্রচিত্তে শুনে যাচ্ছেন। এঁরা সবাই বিপ্লবী, নিজ হাতে অনেক খুন-জখমও করেছেন। কেউই তাঁরা কোমল হৃদয়ের পুরুষ নন। অথচ মায়ের নামে পুত্রের দেয়া অপবাদ শুনে তাঁরা অবধি হতবিহ্বল হয়ে পড়ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণ চাউনি হানছেন শমেতকে লক্ষ্য করে। শমেত যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তাঁদের শান্ত করতে।

'আমি কি করতে পারি বলুন,' সাফাই গাইছেন তিনি। 'সত্য তো কখনও চাপা থাকে না। আর ঘটনা যদি সত্যি না-ই হবে, তবে ছেলে তার মায়ের নামে এসব কথা বলতে যাবে কেন?' কী চমৎকার যুক্তি!

রাজপুত্র পা দোলাচ্ছে আর বক-বক করে চলেছে। তার দিকে হাঁ করে চেয়ে সবাই। কথা বলতে গিয়ে কখনও সখনও জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে, চোখ ঢুলু-ঢুলু। কিন্তু এর কারণ যে নিয়মিত ব্র্যান্ডি পান তা তো শমেত আর সাইমন ছাড়া কারও জানার কথা নয়। সদস্যরা ভাবছেন রাজপুত্ররা অমনই হয়, একটু খেপাটে, একটু আদুরে স্বভাবের। তবে যে যাই বলুক, এ ছেলে মিথ্যেবাদী নয়। যা দেখেছে তা গোপন করছে না, অকপটে জানিয়ে দিচ্ছে। সাহস আছে বলতে হবে।

শমেতকে চুপিচুপি একজন বলেও বসলেন কথাটা। তাঁর কথাটা লুফে নিলেন শমেত।

'আরে ভাই, মায়ের পেট থেকে পড়েই তো আর এমনি হয়নি; হয়েছে আমার হাতে পড়ার পর। এই শমেতকে একদিন দেশের লোকে চিনবে দেখো। এতদিন গাধা পিটিয়ে মানুষ করার কথা সবাই শুনেছ, এবার নিজের চোখেই দেখো রাজা পিটিয়েও মানুষ করা যায় কিনা। আমি ওকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলছি।'

চার্লস দ্য লা স্যাল-জননিরাপত্তা সমিতির একজন সভ্য। পেশাদার ছবি আঁকিয়ে। পঁচিশের আশপাশে বয়স। সে-ও হাজির আজকের সভাস্থলে। লেব্রানের প্রশ্নের জবাবে রাজপুত্র কি বলছে না বলছে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি মর্মে গেঁথে নিচ্ছে এবং একইসঙ্গে পেন্সিলের টানে ডফিনের মুখভঙ্গির সামান্যতম পরিবর্তনটুকুও ফুটিয়ে তুলছে নিপুণ হাতে।

প্রায় গোটা বারো ছবি আঁকা হয়ে গেছে তার। এর মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি ছবি শমেতের দৃষ্টি কেড়ে নিতে তিনি ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটা পরখ করে উপস্থিত সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন।

'দেখুন, দেখুন, কি অদ্ভুত এঁকেছে। হুবহু রাজপুত্রের মুখ, না? লা স্যাল একদিন অনেক বড় শিল্পী হবে এই আমি বলে দিলাম।'

আজকের মত কাজ শেষ। রাজপুত্রকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে, সদস্যরা পা বাড়ালেন তাঁদের অফিসের উদ্দেশে-পরবর্তী ইতিকর্তব্য ঠিক করবেন। ইতিকর্তব্য মানে রানীকে কবে নাগাদ গিলোটিনে দেয়া যায় তা স্থির করা আরকি।

লা স্যালকেও আর সবার সাথে যেতে হলো অফিসে। ওখানে আলোচনায় অংশ নিতে হলো অতি উৎসাহী ভাব নিয়ে। এছাড়া উপায়ই বা কি? কারও ভেতরে উৎসাহের ঘাটতি দেখা গেল তো সে বনে গেল দেশদ্রোহী। দু'দিন পরে গিলোটিন তাকেও আমন্ত্রণ জানাবে।

এসব কাজে-কর্মেই সারাটা দিন চলে গেল লা স্যালের। দরিদ্র পাড়ায় বাসা তার। সেখান থেকে সন্ধের পর একখানা ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে পড়ল ও।

লা স্যাল কিন্তু অভিজাত পরিবারের সন্তান। অথচ গরিবী হালে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। শৈশবে বাবাকে হারিয়ে আজ নিঃস্ব সে। চাচার মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তির মালিক 'হওয়ার' কথা ছিল ওরই। কিন্তু দুর্ভাগ্য! চাচার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি যে। আর তাই হাতছাড়া হয়ে গেছে অগাধ ঐশ্বর্য।

হ্যাঁ, গিলোটিনে শুধু চাচাকেই খায়নি, খেয়েছে জীবিত ভাতিজাটিকেও। চাচার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে বিপ্লবী সরকার। আর পোড়াকপালে লা স্যাল হয়ে গেছে পথের ফকির। তবু তো কপাল ভাল, চাচার সাথে বেচারা থাকত না। তাই রক্ষা পেয়েছে দেশদ্রোহিতার অপবাদ থেকে।

দুর্গতি আরও বাড়তে পারত তার। বেঁচেছে কেবলমাত্র চাচার ভক্ত প্রজাদের কল্যাণে। তারা ওকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে জননিরাপত্তা সমিতিতে। এর ফলে শুধু যে গিলোটিনের কবল থেকে বাঁচল ও তাই নয়, দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। মাসিক ভাতা হিসেবে বছরে চল্লিশ ক্রাউন করে পেয়ে থাকে সমিতির সব সদস্য।

অভাব তারপরও ওর নিত্যসঙ্গী। ছবি এঁকে পেট চলে? সফল শিল্পী হতে

এখনও ঢের বাকি ওর। ভাতার টাকায় দু'বেলা খাবার জুটলেও রাতটা একরকম খালি পেটেই কাটাতে হয়। আর শুধু তো খাবার খরচ নয়, কাপড়-চোপড় কেনা, ঘর ভাড়া এসবও তো আছে।

এই তো এখন জুতোটাও ছিঁড়ল। বৃষ্টি হয়েছে বিকালে, পানি কুলকুল করে ঢুকছে ছেঁড়া জুতোর ভেতর দিয়ে। বারোটা বেজে যাচ্ছে হাঁটতে।

অলিগলি দিয়ে চলেছে সে। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। প্রায়ই ইতিউতি চেয়ে কি যেন লক্ষ করছে। এমুহূর্তে দ্রুতপায়ে রু সেন্ট অনোরের উদ্দেশে এগোচ্ছে ও। অবশেষে থামল এসে রু সেন্ট অনোরের একটা বাড়ির খিড়কি দরজার সামনে। এখানকার ছোট এক ফ্ল্যাটে বাস করেন জাঁ দ্য বাজ। কে ইনি?

ইনি হলেন ব্যারন আর্মানথ্যু। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে সত্যি, কিন্তু তাই বলে তাদের অনুগত প্রজার সংখ্যা কমেনি। তারা অবশ্য খোলাখুলি কোন রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে সাহস পান না। ব্যতিক্রম কেবল এই দ্য বাজ। অন্যরা সবাই কাউন্ট, ব্যারন, ডিউক এসব উপাধি স্থগিত রেখে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন স্রেফ 'সিটিজেন' বলে।

দ্য বাজ কিন্তু তা করেননি। নিজেকে এখনও ব্যারন নামে পরিচয় দেন তিনি। ভয়-ডর বা কোন কিছুর পরোয়া করেন না। ভয়ানক দুঃসাহসী লোক তিনি। রাজবংশের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা রোবেসপিয়ের থেকে শুরু করে সাধারণ বিপ্লবীটি পর্যন্ত জানে, তারপরও দ্য বাজের ধারণা তাঁকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না।

কিন্তু এমন ধারণার ভিত্তি কি?

ভিত্তি আছে। তার কারণ কোন মানুষই লোভের উর্ধ্বে নয়। প্রলোভনের কাছে তাকে কখনও না কখনও মাথা নোয়াতেই হয়-দ্য বাজের অন্তত তাই ধারণা। আর শত্রুকেও লোভ দেখিয়ে বশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। কি সেই ক্ষমতা? টাকা। সাধারণতন্ত্রীদের বিভিন্ন স্তরে লোক আছে তাঁর। তারা প্রচুর ঘুষ পায় তাঁর কাছ থেকে।

কিন্তু এত টাকা আসেই বা কোথেকে? তিনি যে টাকা জাল করেন সে কথা অনেকেই জানে। সে সব নোটের নাম অ্যাসাইনাট। বিপ্লবীদের আমলে এর চল হয়েছে। রাজার আমলে কাগজের নোট ছিল না। নিজেদের খরচা মেটাতে এ নোট চালু করেছে তারা। রাজতন্ত্রের পতনের পর কোষাগার শূন্য পেয়েছে বিপ্লবীরা।

নিজের ছাপাখানা আছে দ্য বাজের। সেখানেই নোট জাল করার কাজটা করে থাকেন তিনি। সে টাকাই চরদের মধ্যে দু'হাতে বিলান। জাল নোট জানলেও নিতে আপত্তি করে না চরেরা। কেননা জাল নোট ধরা কিংবা অপরাধীকে সাজা

দেয়ার ক্ষমতাও তো তাদেরই ওপরে। বাজারে যদি চলে, তবে আর আসল-নকল কি। আসল নোট তো তারা পাচ্ছেই না, জাল নোটও এক দ্য বাজ ছাড়া আর কেউ দিচ্ছে না। কাজেই দ্য বাজ তো তাদের পরম বন্ধু। নিজেদের স্বার্থেই তাঁকে রক্ষা করার ভার নিয়ে নিয়েছে ওরা।

ফ্লোরেন্স দ্য লা স্যাল তাঁর এমনই এক কর্মী। তার নতুন জুতো একটা না হলে চলছে না, তাছাড়া ডিনার খরচাও চাই। সুতরাং জাল নোট গোটা কয়েক না এনে উপায় কি।

সাজানো-গোছানো ঘরটিতে প্রবেশ করে লা স্যাল দেখতে পেল ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। বাতাসে পাইন কাঠের সুঘ্রাণ। দেহ-মন হঠাৎই বেশ চনমন করে উঠল যুবকের।

'এত দেরি হলো যে, ফ্লোরেন্স?' প্রশ্ন করলেন দ্য বাজ। চেয়ারে বসে কি যেন লিখছেন। 'ওখানকার খবর কি?'

পরনের সবুজ কোট আর তিন কোনা টুপি খুলে ফেলল লা স্যাল। মাথার লম্বা কালো চুল ঝাড়া দিল। তারপর টেনে টেনে সুর করে বলল, 'খবর ভাল না। মানুষ যে কতখানি নীচ হতে পারে কল্পনা করা যায় না। শয়তানির একটা সীমা থাকা উচিত।'

শমেত ও সাইমন দম্পতির কীর্তিকলাপের কথা বিস্তারিত জানানোর পর ও শেষ করল এই বলে, 'আমি জোর গলায় বলতে পারি, ছেলেটা যা যা বলল তার কিছুই বুঝে বলেনি। ওকে নেশা জাতীয় কোন কিছু খাইয়ে খাইয়ে মাথার মধ্যে গেঁথে দিয়েছে কথাগুলো। ওইটুকু ছেলের মুখে মায়ের নামে অমন কুৎসিত কথা-বার্তা যে কেমন শোনাচ্ছিল তা আর কি বলব!'

টেবিলে হাতের কলম দিয়ে মৃদু টোকা দিচ্ছেন দ্য বাজ। এটি তাঁর স্বভাব। আর বিষয়টা জানে বলেই লা স্যাল সোৎসাহে তাঁকে গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে। অচেনা কেউ হলে হয়তো ভাবত ওর কথায় ভদ্রলোকের মন নেই।

পুরো বর্ণনা একটানা শেষ করল লা স্যাল। তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে বের করল এক গোছা কাগজ। দ্য বাজের সামনে রাখল তাড়াটা।

'কি এগুলো?' বললেন দ্য বাজ। কলমটা নামিয়ে রেখে টেনে নিলেন গোছাটা।

লা স্যালের আঁকা সেই ছবিগুলো তাঁর সামনে। প্রতিটি ছবিতেই বিচিত্র ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে রাজপুত্র ডফিনকে। বিভিন্ন তার মুখের ভাব।

প্রতিটি ছবি একে একে গভীর মনোযোগে লক্ষ করছেন দ্য বাজ। ক্রমেই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করছে মুখের চেহারা। শেষ ছবিটি পরখ করার পর নিদারুণ হতাশার ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পেল তাঁর অভিব্যক্তিতে।

'এটা কি এঁকেছ, ফ্লোরেন্স?' গোঙানির মত শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

'যা দেখেছি তাই।'

'ছেলেটাকে কি ওরা অমানুষ বানাতে চায়?'

'সেই চেষ্টাই তো চালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

মুখে রা নেই দ্য বাজের। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করছেন।

অগত্যা মুখ খুলতে হলো লা স্যালকেই।

'শত্রুর শেষ রাখবে না ওরা। প্রাণে না মেরে এভাবেই গোড়া মেরে দিতে চাইছে, রাজবংশ যাতে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। দিনের পর দিন এছেলে একটা ফালতু মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে। ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না ওর।'

'তা হতে দেয়া যায় না,' জোরাল গলায় বললেন দ্য বাজ। 'ছেলেটাকে এ থেকে রক্ষা করতে হবে। মুকুট গেলে যাক, কিন্তু অমানুষ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে ওকে।'

'কিন্তু কিভাবে? কি করতে পারি আমরা?' লা স্যালের জিজ্ঞাসা।

দ্য বাজ আবার নিশ্চুপ। কপালে চিন্তার ভাঁজ, টেবিলে খুট-খুট শব্দ করছে কলম।

'রানীকে আপনার উদ্ধার করার চেষ্টা তো ভেস্তে গেছে–' লা স্যাল শুরু করেছিল।

'ভেস্তে যেত না,' কথা কেড়ে নিলেন দ্য বাজ। বিমর্ষ কণ্ঠে আরও বললেন, 'রানীর কাছ থেকে সেরকম সহযোগিতা পেলাম কোথায়? উনি কিন্তু চাইলেই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু কি বলে পাঠালেন তিনি? না, ছেলে-মেয়েকে শত্রুর হাতে ফেলে রেখে তিনি পালাবেন না। কিছু বলাও যায় না, মায়ের মন বলে কথা!'

'আমার অবশ্য একথা জানা ছিল না।'

'জানবেই বা কিভাবে? তোমাকে তো বলা হয়নি। ও কাজে যাদের জড়িয়েছিলাম, তাদেরকে সুইটজারল্যান্ড পাঠিয়ে দিয়েছি বিষয়টা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এখানে থাকলে একজনও প্রাণে বাঁচত না।'

লোকগুলোর পরিচয় জানার চেষ্টা করল না লা স্যাল। কেননা, ও জানে জিজ্ঞেস করলেও জবাব পাবে না।

'ছেলেটা বোধহয় মায়ের মত বোকামি করবে না,' বললেন দ্য বাজ। '...লা স্যাল, ওর ব্যাপারে তোমার কাছে সাহায্য চাইলে পাব তো?'

'নিশ্চয়ই পাবেন।'

'ধরা পড়লে কিন্তু সোজা গিলোটিন।'

'জানি। ভয় পাই না। আর সাহায্য করব ডফিনকে বাঁচাতে নয়, নিজেকে বাঁচাতে। জননিরাপত্তা সমিতির ভাতায় পেট চলে না। ছবি এঁকেও সুবিধে হচ্ছে না। গিলোটিনের ভয় করে কি হবে। রোজই তো জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছি। আপনার জাল নোট দিয়েই তো বাজার-সওদা করি। ধরা পড়লে আমাকে কি আর ছেড়ে দেবে? আজও তো অন্তত দুই লুই চাই। জুতো কেনা দরকার। আপনি তো হাতে অ্যাসাইনাট ধরিয়ে দেবেন। জুতোর দোকানদার যদি জাল বলে চিনে ফেলে–'

'উঁহুঁ, তোমাকে এখন থেকে সোনার লুই-ই দেব। হাজার হলেও রাজপুত্রকে উদ্ধার করতে তোমাকে কাজে লাগাচ্ছি। আচ্ছা, শমেতের সাথে তোমার চেনা-জানা কিরকম?'

'আছে একরকম।'

'ওতে চলবে না। এখন থেকে ভাব জমাতে থাকো। ওকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে।'

'লোকটা না টেম্পলের কারাধ্যক্ষ?'

'সেজন্যেই তো ওর পক্ষে কারাগারের দরজা খুলে দেয়া সহজ!'

দুই

এর কিছুদিনের মধ্যেই রানী অ্যান্টোইনেটকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাল রোবেসপিয়ের। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি চরিত্রহীনা–রাজবংশের মুখে চুনকালি মাখিয়েছেন। এখন রাজতন্ত্র নেই তাতে কি? একদিন তো ছিল। তাদের ইতিহাসই ছিল দেশের ইতিহাস। সে দিক থেকে বিচার করলে, রানীর চরিত্রহীনতার কারণে গোটা ফরাসি জাতির মাথা হেঁট হয়েছে।

আর রানীর বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ তো একেবারে পাকা। তাঁরই গর্ভের সন্তান, রাজপুত্র। ছেলেমানুষ তো কি হলো, ছোটরাই দেখা যায় বেশি সত্যবাদী হয়। ছেলেটা নিজের চোখে যা দেখেছে, যা শুনেছে তাই তো বলেছে। বানিয়ে বানিয়ে বলবার মত বয়স কি তার হয়েছে নাকি? আর হলেই বা, মায়ের নামে কোন ছেলে পারে অমন সব কথা উচ্চারণ করতে?

অগত্যা, বিচার শেষে গিলোটিনে মাথা কাটা পড়ল রানীর। মৃত্যুযাতনার চাইতেও তাঁকে বেশি কষ্ট দেয় অবোধ পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনা। এই ছেলে বড় হয়ে না জানি আরও কত মানুষের ক্ষতির কারণ হবে!

জীবনের শেষ দিন কটা ধিকি-ধিকি জ্বলেছে রানীর অন্তর। আর তা উপলব্ধি করতে পেরে ক্ষণিকের স্বস্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন দ্য বাজ। তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, যত শীঘ্রি সম্ভব ডফিনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা। ডফিনকে মুক্ত করতে দেরি হলে তার নিজের তো বারোটা বাজবেই, অত্যাচারী রোবেসপিয়েরের হাতে দেশটার ধ্বংসও ঠেকানো যাবে না।

রাজতন্ত্রীরা রীতিমত হতাশ। মন ভেঙে গেছে তাদের। মায়ের বিরুদ্ধে রাজপুত্রের যা ভূমিকা, এরকম আর দু'একটা অপকীর্তি ঘটালেই যথেষ্ট–রাজপরিবারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্যে একজন ফরাসিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

দ্য বাজ ওদিকে তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন লা স্যালকে।

'এখনও কিছুই করলে না? সময় তো চলে যাচ্ছে!'

লা স্যাল কিন্তু ধীরে ধীরে ঠিকই এগোচ্ছে, হাত গুটিয়ে বসে নেই। এসব কাজে তাড়াহুড়ো করলে চলে না। চারদিকে বিপদ ওত পেতে আছে। আর তাতে একবার পা দিয়ে ফেললে লা স্যাল তো মরবেই, দ্য বাজও বাঁচেন কিনা সন্দেহ।

পরম সতর্কতা অবলম্বন করে এগোচ্ছে ও। শমেতের সঙ্গে যৎসামান্য আলাপ পরিচয় ছিল। জননিরাপত্তা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যেটুকু থাকতেই হয় আরকি। এখন কিন্তু সে শমেতের সঙ্গে যথেষ্টই ঘনিষ্ঠ। সভাকক্ষে প্রায়ই দেখা যায়, দু'জনে পাশাপাশি বসে রয়েছে। সভা শেষে অনেক সময় নদীতীরে কিংবা টুইলারির বাগানে হাঁটাহাঁটিও করে। টেম্পল কারাগারের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্তও লা স্যাল দু'একবার গেছে শমেতের সঙ্গে। টেম্পলে অবশ্য শমেত বাস করেন না। তবে রোজই সেখানে তাঁকে হাজিরা দিতে হয়। কখনও সাইমনের কাজকর্ম তদারক করতে, আবার কখনও বা রাজপুত্র-রাজকন্যাকে এক নজর দেখে আসার জন্যে। বন্দীদের হালফিল খবরাখবর জানিয়ে আসতে হয় রোবেসপিয়েরকে।

তো, এমনি একদিনের কথা। সন্ধের দিকে শমেত ও লা স্যাল বেড়াতে বেরিয়ে টেম্পলের সামনে এসে হাজির।

এ কারাগারটি আগে ছিল সন্ন্যাসীদের মঠ। বিপ্লবের পর রূপান্তরিত হয়েছে কারাগারে। বিপ্লবীদের ভয়ে সন্ন্যাসী বেচারীরা জান-মান নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছেন, মঠ স্থাপন করেছেন প্রত্যন্ত পল্লীতে।

ফাঁকা পড়ে ছিল টেম্পল। রাজাদের সময়ে কারাগার বলতে লোকে বুঝত ব্যাস্টিল। কিন্তু সেই ব্যাস্টিল ধ্বংস হয়েছে বিপ্লবীদের হাতে। এখন কারাগার তো একটা চাই। কি করা যায়, অগত্যা প্রয়োজনীয় সংস্কার সেরে টেম্পলকেই

কারাগারে রূপ দেয়া হলো।

বহু সন্ন্যাসী বাস করতেন এটিতে। তার ফলে ঘরের অভাব নেই। বিশাল চৌহদ্দি। সীমানার ভেতরে কমপক্ষে বারোখানা দোতলা-তিনতলা দালান। তবে কোনটিই লাগোয়া নয়, ছাড়া-ছাড়া। রাজপরিবারের সদস্যদের রাখা হয়েছে সীমানার মাঝামাঝি অবস্থানের একটি দালানে। একাধিক দরজা রয়েছে ভেতরে ঢোকার। অবশ্য শমেতের দরবারে পৌঁছতে হলে কমপক্ষে তিন-চারটে বাড়ি পেরিয়ে আসতে হবে। তারওপর প্রতিটি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রহরী। কোন বাড়ি হয়তো ব্যবহার হচ্ছে অফিস হিসেবে, কোনটি গুদাম আবার কোনটি হয়তোবা সৈন্যদের ব্যারাক হিসেবে।

শমেত এখানে ঢুকতে উত্তরের গেট ব্যবহার করেন। এদিকের দ্বিতীয় বাড়িটির দোতলায় তাঁর নিজের অফিসঘর রয়েছে। রোবেসপিয়েরের দূত এখানেই সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে। সাইমনকেও প্রয়োজনে তিনি এ অফিসঘরটিতেই ডেকে পাঠান।

ইতোমধ্যে গেটের কাছে বন্ধুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন শমেত। আর নয়, এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে লা স্যালকে। যেমনটা নিতে হয়েছে আগেও কয়েকবার।

শমেত বিদায় জানাতে যাবেন এসময় ফট করে বলে বসল লা স্যাল: 'ওহহো, একটা কথা তাগিস মনে পড়ে গেল। গুজবটা শোনার পর থেকেই মনটা কেমন খচ-খচ করছে। হাজার হলেও আপনি আমার বন্ধুমানুষ। আপনার ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার ওপরও তো বর্তায়, তাই না?'

লা স্যালের ভূমিকা সচকিত করে তুলল শমেতকে।

'তা তো বটেই। কিন্তু গুজবটা কি বললে না তো। আমার ভাল-মন্দ জড়িত এমন কি কথা তোমার কানে এসেছে?'

'শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আমিও করিনি,' ভণিতা করে চলেছে লা স্যাল।

ওদিকে শমেত ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছেন। সে সঙ্গে শঙ্কা দানা বাঁধছে তাঁর বুকে। তিনি তো সাধারণ মানুষ, দিনকাল যা পড়েছে, কত বড় বড় বিপ্লবীকেও তো দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার চূড়া থেকে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছেন—কল্লা দিতে যাচ্ছেন গিলোটিনে। আর রাজতন্ত্রীদের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

এবং যত সর্বনাশের মূলই তো হলো ওই গুজব।

'কি গুজব, ভায়া? চটপট বলে ফেলো না।' কৌতূহলে মরে যাচ্ছেন শমেত।

'সে এমন কিছু না। আপনাকে কেউ দোষ দিচ্ছে না। কিন্তু হাজার হলেও রাজপুত্রের দেখাশোনার ভার যখন আপনার ওপরে, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে

যেতে পারে শুনলে আপনার জন্যে ভয় না হয়ে পারে? আমি যেহেতু আপনার বন্ধু, খানিকটা ভড়কে গিয়ে—'

'কি বললে? ডফিনকে চুরি করে নিয়ে যাবে?' কথা কেড়ে নিয়ে বললেন শমেত। মুখ হাঁ, মুহূর্তে বাক্যস্ফূর্তি বন্ধ। লা স্যাল ভান করল শমেতের মুখের চেহারার অভিব্যক্তি সে লক্ষই করেনি।

'গুজব তো গুজবই, তার আবার কোন ভিত্তি থাকে নাকি?' আপনমনে যেন বলে চলেছে ও। 'কিন্তু গুজবটা যদি ফোকের মত লোকের নামে রটে তাহলে তো খানিকটা গুরুত্ব দিতেই হয়, কি বলেন?'

'ফোকে?' নামটা কোনমতে উচ্চারণ করে, হাত ধরে টানতে টানতে লা স্যালকে ভেতরে নিয়ে গেলেন শমেত।

প্রহরীরা ঢিলেঢালা ভাব নিয়ে ডিউটি করছে। শমেতকে এরা খুব ভাল করেই চেনে। ফলে, তাঁর সঙ্গে লা স্যালকে দেখেও কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

সোজা নিজের অফিসে নিয়ে এলেন ওকে শমেত। ইতোমধ্যে একটি শব্দও বিনিময় করেননি তাঁরা।

কামরায় ঢুকেই বেয়ারাকে এক বোতল বার্গান্ডি নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন শমেত। খুব দামি এই মদ বাজার থেকে লাপাত্তা হয়ে গেছে বিপ্লবের পরপরই। অবশ্য নেতাদের কথা আলাদা। তাদের জন্যে চাইলে বাঘের দুধও মেলে। শমেত সাহেবও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর ভাঁড়ারে দুষ্প্রাপ্য অনেক কিছুই মিলবে।

লা স্যালের চোখ চকচক করে উঠল বার্গান্ডি দেখে।

গেলাসে চুমুক দিয়ে শমেত বললেন, 'তুমি কি সেই ফোকের কথা বলছ?'

লা স্যাল অল্প অল্প করে চুমুক দিচ্ছে। তারিয়ে তারিয়ে স্বাদটা উপভোগ করতে চায়।

'আর কার কথা বলব বলুন?' চুমুক দেয়ার ফাঁকে জবাব দিল ও।

ফোকে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক। একজন সম্মানিত বিপ্লবী সদস্য। তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে আত্মা কেঁপে যায় রোবেসপিয়েরের। ফোকেকে তিনি পাঠিয়ে দেন চালোঁর প্রশাসক করে। ওখানে গিয়ে আরও নাম কামান ভদ্রলোক। তাঁর মত যোগ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি নাকি বিপ্লবীদের দলে আর দুটো নেই। সেই ফোকের নামেই গুজব রটেছে, আর তাই কানে এসেছে আমাদের লা স্যালের।

'ফোকে চালোঁতে আছেন না?' শমেত বললেন।

'ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি প্যারিসে। রোবেসপিয়ের তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কি সব হিসেব-নিকেশ দেখানোর জন্যে। হিসেব-টিসেব ফালতু কথা। রোবেসপিয়ের আসলে ফোকেকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। তিনি কতটা

উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রজাতন্ত্রের ওপর তাঁর ভক্তি এখনও কতটা অটুট এসবই বাজিয়ে দেখবেন আরকি। সামান্য ফাঁক পেলেই ফোকেকে–'

'গিলোটিনে দেবেন?'

বাঁকা হাসি ফুটল লা স্যালের ঠোঁটে।

'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে ফোকেও কিন্তু কাঁচা লোক নন। এত শিগ্‌গিরি তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হবে না। আর সেজন্যেই বোধ হয় রোবেসপিয়েরের গোয়েন্দারা ফোকেকে ফাঁসাতে গুজব রটাচ্ছে। কিছু লোকও যদি এসবে বিশ্বাস করে সেটুকুই লাভ।'

অসহিষ্ণু শমেত আর থাকতে পারলেন না। রীতিমত ক্ষোভের সুর তাঁর গলায়।

'এতক্ষণ ধরে খালি গুজব-গুজব করছ। কার কাছে, কোথায় শুনেছ যে ফোকে ডফিনকে চুরি করতে চাইছেন?'

হতাশার অভিব্যক্তি দেখা গেল লা স্যালের মুখের চেহারায়।

'রেস্তোরাঁয় লোকে ফিসফাস করছে। তাদের নাম-পরিচয় তো আমার জানা নেই, ভাই। তবে আমার বাড়িওয়ালীর কাজের মহিলাটাকে বলতে শুনেছি, ফোকে ডফিনকে উদ্ধার করতে পারলে ডিম নাকি সস্তা হবে। সে কোত্থেকে শুনে এসেছে তা অবশ্য জানি না।'

'কিন্তু ডফিনকে সরিয়ে ফোকের কি লাভ?' শমেত বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন।

'কি লাভ?' অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল লা স্যাল। 'কেন, সীমান্ত পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ড চলে যেতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। ডফিনের মামা অস্ট্রিয়ার সম্রাটের লোক আছে সেখানে। ভাগ্নেকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারলে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বখসিস দিতে দ্বিধা করবেন না সম্রাট। সে টাকায় সারাটা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খেতে পারবে যে কেউ। ফ্রান্সে তার আর ফেরার দরকার আছে?'

'বলো কি, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা!'

'সম্রাটের ভাগ্নে বলে কথা। তবে ফোকে একা কেন, অনেকেই কাজটা হাসিল করার চেষ্টা করতে পারে। আপনি কতজনের ওপর নজর রাখবেন?'

কথা তো সত্যি। শত্রু ঘরেও থেকে থাকতে পারে। জননিরাপত্তা সমিতির কোন সদস্যও যদি একাজে তৎপর হয়, বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবেন না শমেত।

কথাটা তিনি বলেও ফেললেন লা স্যালের কাছে।

'টাকার লোভে মানুষ কি না করে। তাই বলছিলাম কি, আপনার খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার। বলা তো যায় না, বন্ধুর ছদ্মবেশে কখন কে ছোবল দিয়ে বসে–'

'তা যা বলেছ। লাখ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে না, হাজার দশেক পেলেই দেখা যাবে আমাদের ওই সাইমনই হুড়মুড় করে সীমান্তের দিকে ছুটছে।' মুখ আঁধার করে বললেন শমেত।

আজ গরম পানি পায়নি বলে দাড়ি কামানো হয়নি লা স্যালের। খচ-খচ করে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'কথাটা কিন্তু ভেবে দেখার মত। কথায় বলে না ঘরের শত্রু বিভীষণ! শেষে হয়তো দেখা যাবে সাইমন, সুইটজারল্যান্ডে রাজার হালে জীবন কাটাচ্ছে আর আপনি যাচ্ছেন গিলোটিনে।'

'আসি,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল লা স্যাল। 'দ্য ভারিয়ের ওখানে একবার ঢুঁ মারব। পাঁচটা লুই পাই ওর কাছে। ওর মেয়ের ছবি এঁকে দিয়েছিলাম, এখনও পয়সা দেয়নি। বাসা ভাড়াটা আজ রাতের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে। নইলে আজ গরম পানি দেয়নি, কাল হয়তো কম্বলটা কেড়ে নেবে। তাও আর সবার চেয়ে ভাল আমার বাড়িওয়ালী, ভাড়াটেদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার চেষ্টা করে।'

লা স্যালকে বসতে ইঙ্গিত করলেন শমেত। তারপর পকেটে হাত ভরে বের করে আনলেন অ্যাসাইনাট নোটের একটা গোছা। পাঁচটা লুইয়ের সম পরিমাণ টাকা গুনে বাড়িয়ে দিলেন লা স্যালের উদ্দেশে।

'আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে এভাবে চলে যেয়ো না,' অনুরোধের সুরে বললেন। 'ভারিয়ের কাছে না হয় অন্যদিন যেয়ো। আমার চোখ খুলে দিয়েছ তুমি, এখন বুদ্ধিটাও বাতলে দিয়ে যাও। কিভাবে কি করি, আমার মাথা খেলছে না মোটেই।'

টাকাটা পকেটে পুরে আবার বসে পড়ল লা স্যাল। বাকি বার্গান্ডিটুকু বোতল থেকে ঢেলে নিয়ে আরামে গা এলিয়ে দিল। হ্যাঁ, এখন তার আলোচনা করতে আপত্তি নেই।

'বুদ্ধি ধার চাইছেন?'

'হ্যাঁ, বুদ্ধি।'

'নেই যে,' কণ্ঠে সহানুভূতি ফুটিয়ে বলল লা স্যাল। 'কতজনকে ঠেকাবেন আপনি? এ তো আর আমাদের জাল নোটের কারবার নয়, লক্ষ লক্ষ খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা বলে কথা। স্বয়ং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের রাজকোষ থেকে আসছে।'

এক ঢোক বার্গান্ডি গিলে হঠাৎই হা-হা করে হাসতে লাগল লা স্যাল। শমেত তো মহাখাপ্পা ওর কাণ্ডকারখানা দেখে।

'আমি বলে গিলোটিনে কল্লা দিতে যাচ্ছি, আর তুমি কিনা বন্ধু হয়ে মজা কুড়াচ্ছ?'

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল লা স্যাল।

'কিছু মনে করবেন না, আমার ভুল হয়ে গেছে। আসলে হয়েছে কি, এত চমৎকার বার্গান্ডি পান করে এমনিতেই খুশি ছিলাম, তার ওপর শেষ চুমুকটা দিতেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। আপনি হয়তো শুনলে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু আমার মনে হয় বাঁচতে হলে ঠিক এমনটাই করা উচিত।'

'কেমনটা তা বলবে তো?' শমেতের অধীর প্রশ্ন।

'বলছি বলছি।' পরমুহূর্তে আবার বাঁধভাঙা হাসি লা স্যালের।

তার হাসির ফাঁকে যেটুকু উদ্ধার করতে পারলেন শমেত তাতে তাঁর আত্মা খাঁচাছাড়া। এক লাফে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

'এসব কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি,' জোরাল গলায় এবার ঘোষণা করল লা স্যাল। 'বেঈমানদের হাত থেকে ডফিনকে বাঁচাবার ওই একটাই পথ। কাজটা আপনাকেই করতে হবে। হ্যাঁ, আপনিই সরিয়ে ফেলুন ডফিনকে।'

'আমি?' বিস্ময় কাটে না শমেতের।

'অসুবিধা কি? আপনি নিজেই যখন কারাগারপ্রধান।'

'সে না হয় হলাম। কিন্তু ডফিনের ভার রয়েছে সাইমনের ওপর। তাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলেটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব যদি হয়ও, নিয়ে যাবটাই বা কোথায়?'

'কেন, আর সবাই যেখানে যাবে। সীমান্তের ওপারে। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের লোকজন যেখানে টাকার থলি নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

'আরে রাখো তোমার টাকার থলির গল্প। ডফিনকে ওদের হাতে তুলে দিলাম ধরো, কিন্তু আমার বউ-ছেলে-মেয়ের কি হবে? তাদেরকে গিলোটিনের হাত থেকে বাঁচাবে কে শুনি?'

'সে তো ধরা পড়লে। কিন্তু আপনি ধরা পড়বেন কেন? আর প্যারিস ছেড়ে আপনাকেই বা যেতে হবে কেন? আপনার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুকে দিয়েও তো কাজটা করাতে পারেন।'

'মানে তোমাকে দিয়ে তো?' বললেন শমেত। 'তুমি ডফিনকে পার করে দিয়ে দশ-বিশ লাখ স্বর্ণমুদ্রা পকেটে ভরলে, আর যখন জানাজানি হয়ে যাবে রাজপুত্র নেই তখন গর্দানটা যাবে আমার। বাহ্, ভালই বলেছ। আমাকে পাগল পেয়েছ?'

ছোট, এক টুকরো হাসি খেলে গেল লা স্যালের ঠোঁটে। ধূর্ত হাসি। এবার যে পরিকল্পনাটা সে পেশ করল সেটি নিয়ে অনেকবার উল্টেপাল্টে ভেবে দেখা হয়ে গেছে তার। ফলে প্রায় নিখুঁত একটি প্রস্তাব রাখতে পারল।

প্রস্তাবটা এরকম: সাইমনকে ছলে-বলে-কৌশলে চাকরিচ্যুত করতে হবে। কাজটা খুব কঠিন হবে না। কেননা, রাজপরিবারের তদারকির ভার মূলত শমেতের ওপর। তিনি যাকে ইচ্ছে বরখাস্ত করতে পারেন, কেউ বাধা দেয়ার নেই।

সাইমনকে বিদায় করার পর কয়েকদিন অপেক্ষা করবেন শমেত। কারণ, হাত বাড়ালেই তো আর বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক'দিন শমেত স্বয়ং ডফিনের দেখভাল করবেন। আর এরই ফাঁকে মওকা বুঝে এক রাতে তাকে বেহুঁশ করে দেবেন আফিম খাইয়ে। এরপর শুধু ওকে বাক্সে ভরে কারাগারের সীমানা পার করে দেয়া।

ওদিকে, ডফিনের জায়গায় তারই বয়সী একটি ছেলেকে এনে রেখে দেয়া হবে। ওই ছেলেরও থাকবে লালচে চুল, বোঁচা নাক আর বেঁটেখাটো শরীর। চেহারায় মিলও থাকতে হবে যথাসম্ভব। তাছাড়া সে হবে বোবা-কালা। ফলে, নিজের পরিচয় দিতে পারবে না। হাবা-গোবা ধরনের ছেলে আনতে হবে যাতে নতুন জায়গায় এসে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করে।

এই ছেলেটিকে কারাগারে ভরে ডফিনকে কদিনের জন্যে কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন শমেত। ইতোমধ্যে সাইমনের বদলে এসে যাবে নতুন লোক। সে একেই মেনে নেবে রাজপুত্র বলে। কেননা, আগে তো কখনও দেখেনি ডফিনকে।

এরপর কেবল ক'দিনের ব্যাপার মাত্র। শমেত ছুটি নিয়ে সীমান্তের ওপারে চলে যাবেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ডফিনকে। অন্য লোক দিয়ে পাঠাতে হলো না। ফলে, পুরস্কারটাও নিজের হাতে বুঝে নিতে পারলেন। প্যারিসে তাঁর আর ফেরার দরকারটা কি? পরিবারসুদ্ধ তিনি হাওয়া হয়ে যান না কেন প্যারিস থেকে?

কেমন এক লোভ পেয়ে বসল শমেতকে। পরিকল্পনাটা ভয়ানক নাড়া দিয়েছে তাঁকে। কই, তেমন কোন খুঁতও তো দেখতে পেলেন না। নিতান্ত দুর্ভাগ্য যদি গ্রাস না করে, ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কি হবে সামান্য চাকরির মায়ায় এদেশে পড়ে থেকে? তারচেয়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে, বিদেশে রাজার হালে বাস করা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করার পর কথা বললেন শমেত। ইতোমধ্যে আরেক বোতল বার্গান্ডির অর্ধেকখানি খালি হয়ে গেছে।

'ওরকম একটা ছেলে পাচ্ছ কোথায়?' অবশেষে বললেন তিনি।

'সে চিন্তা আমার। দেশে কি বস্তীর অভাব? খোঁজাখুঁজি করলে অমন ছেলে অনেক পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু আমি দাঁও মারলে তোমার কি লাভ তা তো বুঝলাম না?'

'গরীব বন্ধুটিকে না হয় লাখখানেক দিলেনই। আমার অভাবের কথা নতুন করে কি আর বলব। গরম পানি দেয় না বলে দাড়িটা পর্যন্ত কামাতে পারি না।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু রোবেসপিয়ের তোমাকে পাঠাননি তো আমাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে?'

'না, বন্ধু। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমার সত্যি সত্যিই টাকার বড্ড প্রয়োজন।'

কথাটা অবিশ্বাস করতে পারলেন না শমেত।

তিন

'পাওয়া গেছে,' সেদিনের আলোচনার পর তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা শমেতকে জানাল লা স্যাল। জননিরাপত্তা সমিতির সভা শেষে সবে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'কি পাওয়া গেছে?' শমেত বুঝতে পারেননি।

'বোবা-কালা, লালচুলো ছোঁড়া।'

ধড়াক করে উঠল শমেতের হৃৎপিণ্ড।

গত ক'দিন প্রায় সারাক্ষণই এ নিয়ে ভেবেছেন তিনি। টাকার লোভ যেমন হচ্ছে, তেমনি হচ্ছে বিপদের আশঙ্কা। সত্যি বলতে কি, টাকার দিকেই ঝোঁকটা বেশি। ডফিনের মামা, অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার সম্রাট বোনকে বাঁচাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সে অপমান এখনও ভুলতে পারেননি তিনি। এখন যদি ভাগ্নেটিকে উদ্ধার করতে পারেন, তবে তাকে ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে আজীবন ফ্রান্সের বিরোধিতা করে যেতে পারবেন। এজন্যে না হয় ঢাললেনই বা এক-দু'মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা।

www.doridro.com

টাকা যে পাওয়া যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয় যে তবু কাটে না। ধরা পড়লে নির্ঘাত গিলোটিন। মুহূর্তে ভুলে যাওয়া হবে শমেতের সমস্ত অবদান। রোবেসপিয়ের তাঁকে বিন্দুমাত্র দয়া দেখাবেন না। সপরিবারে নির্বংশ হতে হবে তাঁকে।

এই একই বিপদ তাঁর জীবনে নেমে আসতে পারে অন্য কোন লোকও যদি কাজটা করে বসে। বড়জোর দু'দিন দেরি হবে, তারপরই গিলোটিনে খসে পড়বে তাঁর মাথা। এসব কথা ভেবেচিন্তে শমেতের মনে হচ্ছে, ঝুঁকি একটা নেয়া যেতে পারে।

আপাতত তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন। লা স্যাল আগে তার কাজ

সারুক। ডফিনের বদলী জোগাড় হোক, তারপর ইতিকর্তব্য ঠিক করা যাবে।

একটু আগে অবধি বেশ নির্ভাবনায় ছিলেন শমেত। কিন্তু লা স্যাল ছেলে জোগাড় করে ফেলেছে শুনে চুপসে গেলেন। এখন যা করার তাঁকেই করতে হবে।

শমেত ঠিক করলেন, আগে সেই বদলী ছেলেটিকে স্বচক্ষে দেখে আসবেন। পরদিনই সোজা গিয়ে বস্তীতে হাজির হলেন তিনি লা স্যালের সঙ্গে।

টুপি হাতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি। গলায় ঝোলানো ছোট প্ল্যাকার্ডটিতে গোটা গোটা হরফে, লাল রঙে লেখা: 'আমি বোবা-কালা। আমাকে অনুগ্রহ করে সাহায্য করুন।' ভিক্ষে করছে সে।

ভিক্ষে শমেতও দিলেন। সে সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন ছেলেটির বয়স, লাল চুল, বেঁটেখাটো দেহের গড়ন আর বোঁচা নাক।

তবে ডফিনের চুল কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু এরটা ছোট। রাজপুত্রের বড় চুল রাখার কারণ রয়েছে। তার বাঁ কানের লতি ডান কানেরটার চাইতে কিছুটা লম্বা। চুল দিয়ে ত্রুটিটুকু ঢেকে রাখা হয়।

লা স্যালকে কথাটা জানাতে সে আশ্বস্ত করল এই বলে: 'আপনার কাছে তো ক'দিন থাকবে, চুলটাও সেই ফাঁকে বড় হয়ে যাবে।'

লা স্যাল সে রাতেই বস্তী থেকে সরিয়ে ফেলল ছেলেটিকে। নগদ পাঁচ লুই হাতে ধরিয়ে দিতে বাপ-মা ওকে খুশি মনে বেচে দিল।

লা স্যাল অবশ্য নিজের কাছে তোলেনি ওকে। সে ছেলেটিকে সঁপে দিয়েছে দ্য বাজের জিম্মায়। এদিকে, শমেত কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানেন না, দ্য বাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে লা স্যাল। সময় মত ছেলেটিকে তুলে দেবে সে, শমেতকে কথা দিয়েছে।

শমেত এবার জোরেসোরে কাজে নেমে পড়লেন। এখন আর অতটা কঠিন মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। ছেলে জোগাড়ের চিন্তায় আরাম হারাম হয়ে গিয়েছিল। অথচ, কত সহজেই না লা স্যাল কাজটা সেরে ফেলল। একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাতে সুযোগ বুঝে বদলী ছেলেটিকে ডফিনের ঘরে এনে তুলবেন, আর ডফিনকে পাচার করে দেবেন সুইটজারল্যান্ডের উদ্দেশে।

শমেতের প্রথম কাজ এখন, সাইমন দম্পতিকে কারাগার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তবে এ কাজটি করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। জননিরাপত্তা সমিতির সভায় প্রস্তাব পেশ করলেন তিনি। সাইমন দম্পতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানালেন, পরপর চার বছর ধরে তারা দায়িত্বশীলতার সাথে রাজপুত্রের দেখাশোনা করে যাচ্ছে। ফী বছর তাদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা এখানেই। কাউকেই বেশিদিন এক পদে রাখা উচিত বলে মনে করেন না তিনি। কেননা, সৎ মানুষও দীর্ঘদিন বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকলে

অসৎ হয়ে পড়তে পারে। সাইমনের পেটে লাথি মারার কথা তিনি বলছেন না। তাকে রাষ্ট্রের অন্য কোন কাজে লাগিয়ে দিয়ে নতুন আরেকজনকে আনা যেতে পারে ডফিনের তদারকির জন্যে।

তবে শর্ত একটাই। লোকটিকে বিশ্বস্ত হতে হবে।

সমিতির সদস্যরা কেউই দ্বিমত করলেন না এ প্রস্তাবে। সর্বসম্মতিক্রমে চাকরি চলে গেল সাইমনের। পনেরো দিনের মধ্যে সে টেম্পল কারাগার ত্যাগ করবে। তার জায়গায় বিকল্প লোক আনার দায়িত্বও বর্তাল শমেতের ওপর। আর সাইমন যদ্দিন না অন্য চাকরি পাচ্ছে তদ্দিন ঠিকই বেতন পেয়ে যেতে থাকবে। আদতে তার কোন ক্ষতি নেই।

সভায় লা স্যাল হাজির ছিল। হাজির ছিল সাইমনও। এ ব্যাপারে তার কোন বক্তব্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হলো। সাইমন আর কি বলবে, আপত্তি করার কোন কারণ নেই তো। তাকে তো চাকরি আবার দেয়াই হবে। বেতনটাও মার যাচ্ছে না। তাছাড়া, রয়েছে ছুটির হাতছানি। নতুন নিয়োগ না পাওয়া পর্যন্ত শুধু বসে বসে বেতন তুলে যাওয়া।

অবশ্য আপত্তি প্রকাশ না করলেও মনে মনে রীতিমত ফুঁসছে সে। টেম্পলের চাকরিটা আরামের ছিল। এখন আবার কোথায়, কোন্ চুলোয় পাঠাবে কে জানে?

সমিতির সভায় দুটো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা যায়। সামনের সিঁড়িটা সবার জন্যে অবারিত। কিন্তু পেছনেরটা কেবলমাত্র সদস্যরা ব্যবহার করেন। ওটা সুরক্ষিত।

শমেত নামলেন পেছনের সিঁড়ি দিয়ে। লা স্যালেরও ওখান দিয়ে নামার কথা। কিন্তু সাইমন সামনের সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এসে দেখে লা স্যাল ওর জন্যে দাঁড়িয়ে।

'তোমার প্রতি অন্যায় করা হলো,' গলার সুরে সহানুভূতি ফুটিয়ে বলল লা স্যাল। 'কিন্তু সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারলাম না। জানের মায়া বড় মায়া বোঝোই তো।' একটা নির্জন জায়গা দেখে নিয়ে গেল ও সাইমনকে।

লা স্যালের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় নেই সাইমনের। কিন্তু আজকের এই দুর্বল মুহূর্তে যুবকটির মুখে সহমর্মিতার বাণী শুনে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। নাহ, একজন অন্তত দিলদার মানুষ পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলা যায়। কই, লা স্যাল ছাড়া আর কেউ তো তাকে সান্ত্বনা জানাতে এগিয়ে এল না।

ফলে, শমেতের বিরুদ্ধে অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিল সে।

'ওই শমেত ব্যাটা কিনা আমাকে খেদিয়ে দিল! অথচ বলতে পারো কোন্ কাজটা করে ও? রাজপুত্রকে সিটিজেন রোবেসপিয়েরের কথা মত মানুষ করেছি

আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে। শমেত কি করেছে? ডফিন যেদিন মায়ের বিরুদ্ধে বয়ান দিল সেদিন তো তুমিও ছিলে। সবই শুনেছ, ছবিও এঁকেছ। তুমিই বলো, রাজপুত্রের মুখ থেকে ওসব কথা আদায় করার সাধ্য হত ওই শমেতটার?'

ওর কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল লা স্যাল।

'দেখো আমার জায়গায় কাকে এনে বসায়,' বলল সাইমন। 'সে লোক যে রাজতন্ত্রের সমর্থক হবে না কে বলতে পারে।'

'তা তো ঠিকই,' এবার মৌখিক সমর্থন জানাল লা স্যাল। 'আমার তো মনে হয় কিছু একটা মতলব ভাঁজছে ওই শমেত। আর সেজন্যেই কায়দা করে তোমাকে টেম্পল থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।'

'হতেও পারে। দু'দিন আগেও যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল আজ তাকেই যখন খেদিয়ে দিচ্ছে--'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল লা স্যাল।

'ওর এই পরিবর্তনটা কিন্তু গত ক'দিনের মধ্যেই ঘটেছে। প্যারিসে এ কদিনে একটা ভয়ঙ্কর গুজব রটেছে, তুমি জানো কিনা জানি না। অবশ্য গুজবটা শমেতকে নিয়ে নয়, রটেছে ফোকেকে নিয়ে।'

ফোকের নাম শোনামাত্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল ওকে সাইমন।

'কি? কি গুজব? আর শমেতের সাথে তার সম্পর্কই বা কি?'

এই তো চায় লা স্যাল, লোকটা কৌতূহলী হয়ে উঠুক। কণ্ঠে সংশয় ফুটিয়ে জবাব দিতে শুরু করল ও।

'কথাটা অনেকেই জানে। তোমার অবশ্য না জানার কারণও রয়েছে। সারাটা দিন রাজপুত্রকে নিয়ে ব্যস্ত থাকো, তুমি বাইরের খবর রাখবে কখন?'

'গুজবটা কি বলবে তো?' অধীর হয়ে উঠেছে সাইমন।

'সে বড় ভয়ানক কথা, ভাই। রাজপুত্র ডফিনকে নাকি ফোকে চুরি করার চেষ্টা করছেন। আর আমার ধারণা শমেতও জড়িত আছে তাঁর সঙ্গে।'

অস্ট্রিয়ার সম্রাটের কাছে ডফিনকে পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনাটা খোলসা করে বলল লা স্যাল। টাকার পরিমাণের কথাটাও বলতে ভুল করল না।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সাইমন।

'তোমাকে এজন্যেই সময় মত সরিয়ে দিল টেম্পল থেকে। তুমি থাকলে ডফিনকে কস্মিনকালেও সুইটজারল্যান্ডে পাচার করা যাবে না তা কি আর ও বোঝে না?'

'খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা,' সায় দিল সাইমন। 'তা ছেলেটাকে যদি মামার কাছে পৌঁছে দেয় তো দিক, আমার আপত্তির কি আছে? বলতে কি, আমরা স্বামী-স্ত্রী ছেলেটাকে একরকম ভালই বেসে ফেলেছি। নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই কিনা।

কিন্তু কথা হলো আমার চাকরির কি হবে। কোথায় না কোথায় দেবে বদলি করে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

হঠাৎই হেসে উঠল লা স্যাল, ঠিক সেদিন যেমন হেসে উঠেছিল শমেতের ঘরে।

তাজ্জব হয়ে গেল সাইমন। লোকটা পাগল নাকি?

এবার হাসি থামিয়ে গলা খাটো করল লা স্যাল। সেই একই লোভ দেখাল সাইমনকেও। ইচ্ছে করলেই সে বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক হয়ে বিদেশে পরম সুখে বসবাস করতে পারে।

'ডফিনকে পাচার যদি করতেই হয় তবে ফোকে কিংবা শমেত কেন, তুমি নও কেন?'

প্রশ্নটা ভাবনায় ফেলে দিল সাইমনকে। দ্বিধা ও লোভের মিশেল ফুটে উঠেছে ওর চোখের দৃষ্টিতে।

'কাজটা করা কিন্তু তোমার পক্ষে অনেক সহজ। অন্তত ওদের চাইতে। কেননা, ডফিন এখনও তোমার হাতের মুঠোয় আছে,' উৎসাহ জোগাল লা স্যাল। আড়চোখে লক্ষ করল সাইমনের প্রতিক্রিয়া।

হঠাৎই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল সাইমন। ওষুধে ধরেছে, মনে মনে খুশি হয়ে উঠল লা স্যাল। যথেষ্ট হয়েছে, আজ আর নয়।

এরপর দিনের পর দিন দফায় দফায় আলোচনা চলল দু'জনের মধ্যে। শমেতের মত সাইমনকেও লোভে পেয়ে বসেছে। লা স্যাল ওদের দু'জনের সঙ্গে আলাদা আলাদা জায়গায় আলাপ সারছে। শমেতের সঙ্গে কথা হয় তাঁর বাড়িতে। আর সাইমনকে নিয়ে যায় ও নদীর ধারে, লুভরের বাগান কি নটরডেম গির্জায়।

শমেতের সঙ্গে যা পরিকল্পনা করেছে তা এরকম: সাইমন আগে বিদায় হোক, তারপর বদলী ছেলেটাকে এক রাতে ডফিনের ঘরে নিয়ে তোলা হবে এবং একই সঙ্গে ডফিনকে সরিয়ে ফেলা হবে টেম্পল কারাগার থেকে।

ডফিন লা স্যালের হেফাজতে থাকবে দু'একদিন। এই এখন যেমন বস্তীর ছেলেটা রয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন লোক এসে যাবে ডফিনের জায়গায়। তাকে বহাল করে ছুটি নেবেন শমেত, এবং ডফিনকে মেয়ে সাজিয়ে সুইটজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য লা স্যালও থাকবে। সাহস জোগাবে আবার বখরাও বুঝে নেবে।

এদিকে সাইমনের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে এরকম: সাইমন যেদিন কারাগার থেকে বিদায় নেবে সেদিন তার মাল-সামান বইতে একখানা মালগাড়ি আসবে। সেই গাড়ির ভেতর থাকবে প্রকাণ্ড এক কাঠের ঘোড়া। তার পেটের ভেতর থাকবে

বস্তীর ছেলেটা। আর চালক স্বয়ং ছদ্মবেশী লা স্যাল।

সাইমন কিন্তু ভেবে বসে আছে এ ছেলেটিকে তারই প্রয়োজনে জোগাড় করা হয়েছে। এ যে আগে থেকেই দ্য বাজের আশ্রয়ে রয়েছে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ও।

যা হোক, পরিকল্পনা তৈরি। লা স্যালের ধারণা এতে কোন ত্রুটি নেই। এমনকি দ্য বাজের মত সতর্ক-সাবধানী লোকও তার পরিকল্পনায় কোন খুঁত বের করতে পারেননি।

শেষমেশ এসে গেল সাইমনের বিদায়ের দিনটি। একটানা চার বছর দায়িত্ব পালন করার পর আজ চলে যাচ্ছে সে।

জননিরাপত্তা সমিতির চার সদস্য সন্ধেবেলা আসবেন। যদ্দিন না নতুন লোককে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এঁরা পালা করে পাহারা দেবেন রাজপুত্র ডফিনকে।

বিকেল নাগাদ সমিতির সদস্যরা হাজির হয়ে গেলেন। তিনতলা কারাগারটির নিচতলায় রয়েছে অফিস, বসার ঘর ও কয়েকটা গুদামঘর। রানী অ্যান্টোইনেটের ব্যবহৃত আসবাবপত্রগুলো স্থান পেয়েছে এখানে।

নিচতলায় বসেছেন সমিতির সদস্যরা। সাইমন তাঁদের আপ্যায়ন করছে নানারকম সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে।

তুমুল বৃষ্টি বাইরে। বার্গান্ডি পানের ফাঁকে ফাঁকে স্যান্ডউইচ চিবোচ্ছেন সভ্যরা।

'সিটিজেন শমেত আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন,' সাইমন একসময় বলল। 'উনি সত্যিই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম অবসর নিয়ে ইতালি চলে যাব। ওখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব। আমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেই যেন এই গুরুদায়িত্ব থেকে উনি মুক্তি দিলেন আমাকে।'

'আপনাকে অন্য চাকরি দেবে শুনলাম যে,' বললেন সভ্যদের একজন।

'তা দিতে অবশ্য চাইছে। কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী দুটি মাত্র প্রাণী। কী-ই বা খরচ আমাদের বলুন! তাছাড়া এত বয়স হলো কিছু সঞ্চয় কি আর হয়নি? আর কত কাজ করব। দেশের কাজে লাগতে পেরেছি সে-ই তো আমার কতবড় সৌভাগ্য। এখন আমার সময় ফুরিয়েছে, অন্য লোক আসবে–দুনিয়ার এই তো নিয়ম।'

সাইমনের দর্শন শুনে সভ্যদের ধারণা হলো, চাকরিচ্যুতির দুঃখে বেচারা এসব উল্টোপাল্টা বকবক করছে। আসলে কিন্তু তা নয়। স্রেফ সময় নষ্ট করছে লোকটা। লা স্যাল না আসা অবধি রাজপুত্রের কামরায় সে কাউকে ঢুকতে দেবে না।

শেষে, সন্ধে গাঢ় হতে একটা মালগাড়ি এসে দাঁড়াল এ বাড়ির সিঁড়ির

তলায়। অঝোরে তখনও বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

'এই ঘোড়াটা কোথায় নামাব?' গাড়ির চালক কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। মেজাজ খিচড়ে আছে তার। বৃষ্টিতে ভিজে একসা, তাকে দোষ দেয়া যায় না।

কিসের ঘোড়া? জানালার কাছে এসে জড় হলেন কৌতূহলী সদস্যরা।

দেখা গেল, মালগাড়ির ওপরে লাল রঙা অতিকায় এক কাঠের ঘোড়া শুইয়ে রাখা হয়েছে।

সভ্যদের কৌতূহল মেটাতে এগিয়ে এল সাইমন।

'রাজপুত্রের শখ হয়েছে!' ব্যঙ্গের সুরে বলল। 'ওর আহ্লাদ দেখলে মনে হয় এখনও ওর বাপের রাজত্ব আছে।'

সাইমন এবার গলা ছাড়ল চালকের উদ্দেশে।

'ও হে, ঘোড়াটা তোমরা দোতলায় তুলে দাও দেখি। ওখানে আমার গিন্নী রয়েছে, সে ওটা বুঝে নেবে। আর এসেই যখন পড়েছ, আমাদের লটবহরও নামিয়ে এনো–এই বেলা চলে যাই। পয়সা নিয়ে ভেবো না। বিনে পয়সায় কাজ করাব না।'

'এই ভারী কাঠের ঘোড়া এখন ওপরে তুলতে হবে?' গর্জে উঠল গাড়ির চালক।

'আচ্ছা বেয়াদব তো,' মন্তব্য করলেন সদস্যদের একজন। 'এদের আচার-আচরণ দেখলে মনে হয় বোর্বোদের কঠোর শাসনই এদের জন্যে ঠিক ছিল।'

তাঁর কথায় এক বাক্যে সম্মতি দিলেন অন্যান্যরা।

গাড়ির দিক থেকে এঁদের নজর ফেরাতে হবে, ভাবল সাইমন। তাই আবারও কথার খেই ধরল সে।

'ছোঁড়ার আবদার শুনলে বাঁচি না,' বলল মুখ বাঁকা করে। 'সেদিন আমার গিন্নীর কাছে ট্রয়ের গল্প শুনেছে। আর রক্ষে আছে? বলে কিনা অমন একখানা কাঠের ঘোড়া তারও চাই। শমেত সাহেবেরও দয়ার শরীর, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লেভিয়ার শেভ্রোজেকে ঘোড়ার অর্ডার দিয়ে দিলেন। আর সেই ঘোড়া কিনা আর আসার সময় পেল না, আজকেই এসে হাজির।'

সিঁড়িতে তখন ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে ঘোড়া উঠে যাচ্ছে দোতলায়। আর সে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে চলেছে গাড়ির চালক।

'দোতলায় ঘোড়া তুলতে হবে জানলে কোন্ গাধা আসত গাড়ি নিয়ে? এ কি একটুখানি জিনিস যে তুলে দাও বললেই তুলে দিলাম?'

চার

সাইমনের স্ত্রীর সঙ্গে এরপর তুমুল বচসা শুরু হলো গাড়িচালকের। নিচ থেকে যদ্দূর যা বোঝা গেল, গাড়িচালককে যে পরিমাণ মোট বইতে বলছে মহিলা তাতে তার প্রবল আপত্তি আছে। অত মালপত্র সে তার গাড়িতে চাপাতে মোটেই রাজি নয়।

সাইমন কিন্তু নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

'হেঁ হেঁ, এই শ্রেণীর লোকেদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমার স্ত্রী খুব ভাল জানে। দেখবেন ওই এক গাড়িতেই সব মাল তুলিয়ে ছাড়বে। হ্যাঁ, মানছি একখানা গাড়ির তুলনায় বোঝা একটু বেশিই হয়ে গেছে। কিন্তু যা বৃষ্টি, তা নাহলে আরেকটা গাড়ি ডেকে আনা যেত।'

সভ্যরা এখন বার্গান্ডি পান করছেন তারিয়ে তারিয়ে। তাঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না এসব তুচ্ছ বিষয়ের দিকে।

'তা বৃষ্টি হচ্ছে বৈকি,' একজন শুধু মন্তব্য করলেন সাইমনের খাতিরে।

'এই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বিদেয় হতে হবে আমাকে; এতদিনের ঘাঁটি ছেড়ে,' বলল সাইমন। 'ওদের মাল-সামান নামানো হয়ে গেলেই আপনাদের ওপরতলায় নিয়ে যাব। রাজপুত্রকে আপনাদের হাতে সঁপে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।'

ওর কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন সভ্যরা।

ইতোমধ্যে, গাড়ির চালক ক্ষোভ ঝাড়তে ঝাড়তে একে একে সব লটবহর নামিয়ে আনছে। তার ক্ষোভের কারণ আর কেউ নয় সাইমনের স্ত্রী। এহেন অবিবেচক, জাঁহাবাজ মহিলা সে নাকি বাপের জন্মে দেখেনি। এখন তার ভয়, এত মাল বইতে গিয়ে গাড়িটা না ভেঙে পড়ে যায় রাস্তায়।

ক্রুদ্ধ লোকটা শেষবারের মত নেমে যেতেই সাইমন ইঙ্গিত করল সভ্যদের উদ্দেশে। ফলে, বার্গান্ডির গ্লাস রেখে উঠে পড়তে হলো চার সভ্যকে। এবার রাজপুত্রের দায়িত্ব বুঝে নিতে হয়।

সভ্যরা সিঁড়ি ভেঙে কিছুদূর উঠতে না উঠতেই বিশাল এক মোট গড়াতে গড়াতে তাঁদের দিকে নেমে এল।

'অ্যাই, গর্দভ, এই বিছানাপত্তর কে নেবে শুনি? এটা ফেলে চলে গেলি কোন্ আক্কেলে?' চিল চিৎকার দিয়ে উঠল সাইমনের স্ত্রী।

সাইমন ও সভ্যরা একপাশে সরে দাঁড়ালেন আত্মরক্ষার খাতিরে। সাইমনের

স্ত্রী নেমে এল মোটের পেছন পেছন।

'শুভ রাত্রি, সিটিজেনরা,' গলায় মধু ঢেলে বলল মহিলা। 'কিছু মনে করবেন না। গাড়িওয়ালা লোকটা ভীষণ অভদ্র। যান, ওপরে যান। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে যেতে হচ্ছে। ওকে ছেড়ে যেতে কী কষ্ট যে হচ্ছে কি আর বলব। হতে পারে রাজার ছেলে, কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসত।' গলা ধরে এল ওর। রুমাল বের করে চোখ মুছে নিল।

সাইমনের স্ত্রী নেমে গেল নিচে, আর সাইমন অতিথিদের নিয়ে উঠে এল ওপরে।

কামরায় আসবাবপত্র হাতে গোনা, কিন্তু মূল্যবান। দেয়াল লাগোয়া একখানা মেহগনি কাঠের খাট। রাজপুত্র লুই ওতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, দেয়ালের দিকে মুখ করে। কাজেই মুখের চেহারা দেখতে পেলেন না সভ্যরা। কিন্তু তাতে কি, এক মাথা লাল চুল তো দেখাই যাচ্ছে! আর রাজপুত্রকে শনাক্ত করতে ওই লাল চুলই যথেষ্ট। ফলে, কেউই তার মুখ দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

সদস্যরা এবার একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সাইমন ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিল। সভ্যদের একজন নিজের হাতে তালা দিলেন দরজায়। এবার খাতা সই করতে হবে তাঁদের নিচে গিয়ে। এরপর দু'জন আবার উঠে আসবেন রাজপুত্রকে পাহারা দিতে, আর বাকি দু'জন চলে যাবেন যার যার বাড়ি।

সাইমন সভ্যদের নিয়ে নিচে নেমে এল। খাতা বের করে সই নিল সদস্যদের সবার কাছ থেকে। স্বহস্তে তারিখও বসালেন তাঁরা। সিংহাসনচ্যুত বোর্বোঁ রাজবংশের রাজপুত্র ডফিন, যার বয়স আনুমানিক নয় বছর, বন্দী হয়ে আছে টেম্পল কারাগারের দোতলার একটি কামরায়–একথা পরে আর অস্বীকার করার উপায় থাকল না তাঁদের। ব্যস, সাইমন তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

বিরস বদনে সভ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিল সাইমন। তারপর মাল গাড়িটার আলো লক্ষ্য করে পা বাড়াল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে আঁধার। তখনও কানে আসছে বেয়াড়া গাড়িচালকটির সঙ্গে সাইমনের স্ত্রীর কথা কাটাকাটির শব্দ।

মূল প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি চলে এসেছে সাইমন। মালগাড়িটা এখনও গেট পেরোতে পারেনি। পাহারা রয়েছে গেটে। কোন জিনিস পরীক্ষা না করে কারাগারের ভেতর ঢুকতে কিংবা বেরোতে দেয়ার নিয়ম নেই। তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে গাড়িচালককে।

'কোন্ কুক্ষণে যে এসেছিলাম এখানে,' গজগজ করে উষ্মা প্রকাশ করল গাড়িচালক। 'এমনিতেই ভিজে শেষ, তার ওপর আবার পরীক্ষার নামে এক ঘণ্টা

দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নির্ঘাত অসুখে পড়ব। গাড়ি চালিয়ে ক'পয়সাই বা পাই? চিকিৎসার খরচ আসবেটা কোত্থেকে?'

কিন্তু প্রহরীরা ওর কথা শুনবে কেন?

'ওসব কথা আমাদের শুনিয়ে লাভ নেই। আমাদের ওপর হুকুম আছে পরীক্ষা করতে হবে। আইন আইনই।'

'চমৎকার,' শ্লেষের সুর লা স্যালের কণ্ঠে। 'এরাও দেখি আইনের বুলি কপচায়। এতদিন চলেছে রাজার আইন, আর এখন চলছে সৈন্যদের আইন। আমাদের মত গরীবরা মরে মরুকগে যাক।'

এসব কথা শুনে ভারী রাগ হয়েছে এক প্রহরীর। মালগাড়ির ওপরদিকে রাখা একটা বোঝা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সে। ওটাকে ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছিল ওখানে। বোঁচকাটার ভেতরে রয়েছে কাঁচের বাসন-কোসন। ফলে, যা হওয়ার তাই হলো। মাটিতে পড়া মাত্র সব চুরমার।

আর যায় কোথায়, তৈরিই ছিল সাইমনের স্ত্রী–রীতিমত আহাজারি জুড়ে দিল।

'হায় হায় রে, আমার সব গেল রে। ওরে হতচ্ছাড়ার দল, তোদের কোন্ আইনে আছে যে মানুষের থালা-বাসন সব ভেঙে চুরমার করতে হবে? আর ভাঙলি তো ভাঙলি তাও কিনা সাইমনের জিনিসপত্র? যে মানুষটা বিপ্লবী সরকারের জন্যে শুধু জানটা দিতে বাকি রেখেছে তার এতবড় ক্ষতিটা করে দিলি? পচা, ওই সিল্কের কাপড়গুলোও পানিতে চুবিয়ে পচা।'

বাসন ভেঙে প্রহরীরা হতভম্ব। ভড়কে গেছে তারা, পরীক্ষা চালাতে গিয়ে আরও কি না জানি ভেঙে বসে!

এই যখন অবস্থা তখন হস্তক্ষেপ করল সাইমন।

'এই যে বন্ধুরা, তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সমিতি আপাতত আস্তাবলের ওপরে তিনতলায় একটা কামরা দিয়েছে। ওখানে সপ্তাহ খানেক আছি। তারপর হয়তো রসদ বিভাগে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে।··· আরে,' হঠাৎই যেন খেয়াল হয়েছে এমনি ভঙ্গিতে গাড়িচালককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'করেছ কি? বাসনপত্র সব ভেঙে ফেলেছ? জানো, তোমাকে আমি এক্ষুণি গ্রেপ্তার করাতে পারি? আমার এই বন্ধুদের বললেই তোমাকে সিধে কয়েদখানায় চালান করে দেবে। আমি সিটিজেন শমেতের লোক, বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর তুমি কিনা আমার বাসনপত্র ভাঙো? এতবড় স্পর্ধা তোমার!'

প্রমাদ গুণল সৈন্যরা। সাইমন যদি সত্যি সত্যি রসদ বিভাগে চাকরি পায়, তাহলে পরে অসুবিধা হতে পারে। কেননা, সেনাপতিরা তো রসদ বিভাগের একান্ত অনুগত। কাজেই আর বাড়াবাড়ি নয়। সাইমনকে আর না ঘাঁটিয়ে নির্বিঘ্নে

যেতে দেয়া যাক।

বাসন-কোসনের বোঝা প্রহরীরা নিজেরাই ধরাধরি করে তুলে দিল মালগাড়িতে। লা স্যাল এবার বেরিয়ে পড়ল গজ-গজ করতে করতে। সাইমনরা হেঁটে আসবে।

সাইমন রসদ বিভাগে কাজ পেলে এদের দিকে লক্ষ রাখবে কথা দিয়ে বিদায় নিল। সাইমনের স্ত্রীর ঝগড়ুটে গলাও শেষ পর্যন্ত মিশে গেল রাতের অন্ধকারে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রহরীরা।

মালগাড়ি এসে থামল সেই আস্তাবলের কাছে, আপাতত যেখানে ঠাঁই হয়েছে সাইমনের। মালপত্র নিজে যতটা পারে নামাতে লাগল লা স্যাল। সাইমন ও তার স্ত্রী এলে তারাও হাত লাগাবে।

শেষ অবধি এসে হাজির হলো স্বামী-স্ত্রী। কোথায় গেল সাইমন গিন্নীর তারস্বরে চেঁচামেচি, তার বদলে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, 'বাচ্চাটার দম বন্ধ হয়ে যায়নি তো? যে মালপত্র চাপিয়েছ তোমরা!'

লা স্যাল কি আর সে চিন্তা করেনি? ও বুদ্ধিমান ছেলে। আগে কখনও মালগাড়ি না চালালেও মাল বোঝাই দেয়ার কায়দা কারও চাইতে কম জানে না সে।

ওপরের বোঝাগুলো নামিয়ে ফেলা হলো। দেখা গেল একটা বেঞ্চি বসানো আছে। ওটার দু'ধারে নানা আকারের ছোট-বড় পুঁটলি দিয়ে ঠেক দেয়া হয়েছে, পড়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বেঞ্চিটার নিচে কম্বলে মোড়ানো একটি শিশুর দেহ। আফিম খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। রাজপুত্র ডফিনকে এভাবেই পাচার করে আনা হয়েছে দুর্ভেদ্য টেম্পল কারাগার থেকে।

'আহা রে বেচারা!' সাইমনের স্ত্রী গায়ে হাত বুলোচ্ছে ছেলেটির। এই চার বছরে সত্যিই মায়া পড়ে গেছে তার অসহায় রাজপুত্রের ওপরে।

'রাজপুত্র বৃষ্টিতে ভিজছে। সময় নষ্ট না করে শিগ্‌গিরি মালপত্র ঘরে তোলো দেখি,' তাড়া লাগাল লা স্যাল। 'যে কোন মুহূর্তে পুলিস এসে পড়তে পারে। বাব্বা, কী বাঁচাটাই বাঁচলাম! একটু এদিক-সেদিক হলে আজ আর কারোরই বেঁচে ফিরতে হত না। কি হলো, বললাম না আমাকে এক্ষুণি কেটে পড়তে হবে?'

'ওকে কোথায় রাখছ বললে না তো?' সাইমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল।

'বিদঘুটে ঠিকানা, মনে রাখা শক্ত। লিখে যে দেব তারও উপায় নেই। কারও হাতে পড়লে সর্বনাশ হবে। তুমি বরং পরশু দিন আমার বাড়ি এসো, চেনোই তো। ঠিকানাটা ওখানেই না হয় মুখস্থ করে নেবে। এমনও হতে পারে, তোমাকে

নিয়ে গেলাম ওই গোপন জায়গাটায়।'

সাইমনের স্ত্রী এসময় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলে উঠল।

'বাছাকে ছাড়তে আমার মন চাইছে না!'

আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করল না লা স্যাল। মালগাড়ি ঠেলা দিয়ে পিছন দিকে চাইল।

'আগেও বহুবার বলেছি ওকে এখানে রাখলে আমাদের তিনজনেরই মাথা কাটা যাবে গিলোটিনে। শমেত কিন্তু কাল সকালেই ডফিনকে খুঁজতে এখানে হাজির হয়ে যাবে। তখন? এখন একটু ধৈর্য ধরে থাকো, পরে না হয় অস্ট্রিয়ায় ওর কাছে চলে যেয়ো দু'জনে।'

লা স্যাল আজই প্রথম এসব কথা বলছে তা তো নয়, তাছাড়া তার কথাকে অযৌক্তিকও বলার উপায় নেই। কাজে কাজেই নিজেকে সামলে নিল সাইমন গিন্নী।

লা স্যাল গাড়ি নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে তখন দ্য বাজের বাড়ির উদ্দেশে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এতে রাজপুত্রের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা যেমনি রয়েছে তেমনি সুবিধেও কম নয়। এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। গোটা রাস্তায় কোথাও কোন পুলিস চোখে পড়ল না।

জানালা দিয়ে মালগাড়িটাকে আসতে দেখেই দ্য বাজ দরজা খুলে দিয়েছেন। কি মাল টানা হচ্ছে ওতে আর কে টানছে বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি তাঁকে।

ডফিনের অচেতন দেহ কাঁধে তুলে নিল লা স্যাল। আর তার মুহূর্ত পরে দ্য বাজের বাড়ির নিচতলা থেকে বেরিয়ে এল এক পুরোদস্তুর ঠেলাওয়ালা। গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে পাশের এক গলিতে নিয়ে গেল সে। এ লোক দ্য বাজের অনুগত এক রাজভক্ত। এদের মত মানুষ সমাজের সর্বস্তরে এখনও ছড়িয়ে আছে। দ্য বাজের কথায় এরা ওঠ-বস করে।

দ্য বাজের আগে লা স্যালই উঠে এল দোতলায়। পেতে রাখা সোফায় শুইয়ে দিল ডফিনকে। আফিমের ঘোর তখনও কাটেনি ওর। ইতোমধ্যে দ্য বাজ প্রবেশ করেছেন ঘরে। ক'মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি ঘুমন্ত বালকের মুখের দিকে।

হাত কাঁপছে দ্য বাজের, লক্ষ করল লা স্যাল। কাঁপা-কাঁপা হাতে ডফিনের দু'কানের ওপর থেকে লালচে চুল আলগোছে সরিয়ে দিলেন তিনি। লা স্যাল ও দ্য বাজ লক্ষ করলেন ডফিনের একটি কানের লতি অন্যটির চাইতে পুরু ও লম্বা।

দ্য বাজ এবার চুল দিয়ে আবারও ঢেকে দিলেন ডফিনের দু'কান। তারপর হাঁটু মুড়ে বসলেন সোফার পেছনে।

'রাজা, আমাদের রাজা!' বলে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন। শুধু তাই নয়, ঘুমন্ত বালকটির ডান হাতখানা টেনে নিয়ে চুমোর পর চুমো খেতে লাগলেন।

এতদিন মেলামেশার পরও ধারণা করতে পারেনি লা স্যাল এতটা আবেগপ্রবণ মানুষ এই দ্য বাজ। সে তাজ্জব বনে গেল।

এঁরা দু'জন ছাড়াও তৃতীয় এক জন প্রথম থেকেই উপস্থিত রয়েছেন কামরায়। দীর্ঘদেহী, মাঝবয়সী জনৈক অভিজাত পুরুষ। চেহারা দেখে মনে হয় সামরিক অফিসার। দ্য বাজের মত তিনি অবশ্য আবেগে গা ভাসিয়ে দিলেন না। দ্য বাজ শান্ত হতে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন দু'কদম।

'এতটা আবেগপ্রবণ হলে তো চলবে না, মঁসিয়ে দ্য বাজ,' বললেন তিনি। 'প্রাথমিক কাজটুকু কেবল শেষ করা গেছে। এখনও কিন্তু আসল কাজ বাকি। যাকগে, এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই মঁসিয়ে লা স্যাল–যাঁর কথা আপনার মুখে অনেক শুনেছি?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, ব্যারন ফন ইনেজ।' জানালেন দ্য বাজ। 'এই ছেলে যে শুধুই ভাল শিল্পী তা নয়, এসব বিপজ্জনক কাজেও যে কম যায় না নিজের চোখেই দেখলেন। আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। জেনেই গেছেন ও লা স্যাল, আর, লা স্যাল, ইনি ব্যারন ফন ইনেজ–প্রুশিয়ার রাজা মহান ফ্রেডরিকের বিশ্বস্ত একান্ত সচিব।'

অবাক হয়ে গেল লা স্যাল।

'প্রুশিয়া?' তবে যে এতদিন শমেত ও সাইমনকে সে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভাগ্নেপ্রীতির কথা শতমুখে বলে এসেছে? সে নিজেও তো অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছে।

কিন্তু আজ একি শুনছে? অস্ট্রিয়ার বদলে তারমানে প্রুশিয়ায় পাচার করা হবে রাজপুত্র ডফিনকে?

দ্য বাজ তখন বলে চলেছেন, 'রাজা ফ্রেডরিক আমাদের জানিয়েছিলেন, ডফিনকে মুক্ত করা গেলে তার জন্যে প্রুশিয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, কাজটা সফল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলেই তাঁকে খবর পাঠাব। লা স্যাল, তুমি কাজে নামার সঙ্গে সঙ্গেই খবর আমি পাঠিয়ে দিই। কারণ আমার কেন জানি বিশ্বাস জন্মেছিল তুমি ব্যর্থ হবে না।'

'সবই ঈশ্বরের দয়া,' বলল লা স্যাল। 'নইলে এত সহজে কাজ হাসিল হত না।'

'গিলোটিনে মাথা কাটা পড়লে কেউ কাজটাকে সহজ বলতে পারত না, পড়েনি বলে সহজ,' বললেন ফন ইনেজ। তাঁর রসিকতায় মৃদু হাসলেন দ্য বাজ ও লা স্যাল।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক,' বললেন ফন ইনেজ। 'আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি জানা থাকা দরকার মঁসিয়ে লা স্যালের।'

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হলো। ডফিনের ঘুম ভাঙলে তাকে পেট পুরে খাওয়ানো হবে, তারপর আজ রাতের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হবে প্রত্যন্ত এক শহরে। ওর সঙ্গে যাবেন দ্য বাজ ও ফন ইনেজ। লা স্যাল যাচ্ছে না। তার কারণ, ডফিন নিখোঁজ হওয়ার খবর কালই জানাজানি হয়ে যাবে। আর কেউ না জানুক, নিরাপত্তা সমিতির সভ্যরা ঠিকই জেনে যাবেন। তখন খোঁজ পড়বে, রাজপুত্রের সঙ্গে আর কোন গণ্যমান্য লোক রাজধানী ছেড়েছেন কিনা। তেমন কারও খোঁজ বেরলে তাঁর ওপর সন্দেহ পড়বে, রাজপুত্রের অন্তর্ধানের ঘটনায় তিনিও জড়িত।

লা স্যাল যেতে পারছে না, কিন্তু পারলে অন্য অনেকরকম ঝামেলা থেকে সে বেঁচে যেত। আর ঝামেলা হবে না-ই বা কেন? দু'দুটো লোককে সে ভাঁওতা দিয়েছে। শমেত ও সাইমন দু'জনই এখন লাখ-লাখ মোহর আর প্রবাসী সুখী জীবনের সুখস্বপ্ন দেখছে। সেখানে সর্বক্ষণ গিলোটিনের চোখ রাঙানি থাকবে না, থাকবে শুধু টাকার গদিতে বসে আয়েশ করার অবারিত সুযোগ।

কিন্তু এখন তো তারা জবাব চাইবে, জানতে চাইবে রাজপুত্র কোথায়!

শমেতকে দাবড়ানি দেয়া সহজ হবে। কেননা, সাইমনের বিদায়-নাটকে লা স্যাল যে প্রধান অভিনেতার ভূমিকায় ছিল সেটি তো তিনি জানেন না।

'রাজপুত্র কোথায় তার আমি কি জানি? সাইমনকে জিজ্ঞেস করুনগে যান,' বলে দিতে পারবে লা স্যাল।

শমেত সকাল বেলায় এসে হাজির। কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি তাঁর।

'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, লা স্যাল। সাইমন কাল রাতে ডফিনকে সাথে করে নিয়ে গেছে। ডফিনের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে যে চারজন গিয়েছিল তারা কিছুই টের পায়নি। ওদের দিকে পিঠ দিয়ে একটা লালচুলো ছেলেকে ঘুমোতে দেখেছে। ওকে দেখে মনে করেছে ও-ই ডফিন। আজকে আমি গিয়ে–'

'দেখলেন অন্য ছেলে?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল লা স্যাল।

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে বোবা-কালা। এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। কানেও কিছু শোনে বলে মনে হচ্ছে না। আরও আশ্চর্যের কথা কি জানো, এটার চেহারা হুবহু তোমার সেই বদলীটার মত।'

'বস্তীর ছেলেদের চেহারা প্রায় একইরকম হয়। আপনাদের মত অভিজাত লোকের চোখে ওটুকু পার্থক্য ধরা পড়বে না,' বুঝ দিতে চেষ্টা করল লা স্যাল।

শমেত মোটেই অভিজাত বংশের নন। বিপ্লবের আগে তিনি ছিলেন নাপিত। লা স্যাল তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছে না তো, ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি।

'তার ওপর,' বলে চলেছে লা স্যাল, 'চুলের রং একরকম হলে তো কথাই নেই। যাকগে, সাইমন শেষ পর্যন্ত এতবড় শয়তানিটা করল? কাল যখন সে টেম্পল ছাড়ে তখন তার মালপত্র ঠিকমত পরীক্ষা করা হয়েছিল?'

'প্রহরীরা তো বলছে হয়েছিল। এখন অবশ্য স্বীকারও করবে না।'

লা স্যাল যেন মহা চিন্তায় পড়ে গেল।

'আপনি সাইমনকে ধরুন গিয়ে, সে সব জানে।'

কালবিলম্ব না করে ছুটলেন শমেত। সাইমনের অস্থায়ী বাসাটা বেশি দূরে নয়। ওটা মঠের আস্তাবল ছিল আগে। বিপ্লবের পরে মঠ উঠিয়ে দিয়ে আস্তাবলের ওপরে আরও দুটি তলা তোলা হয়েছে। জননিরাপত্তা সমিতির বেশিরভাগ সদস্য গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা। প্যারিসে তারা থাকবে কোথায়? তাদের জন্যেই মূলত এই দোতলাটি তোলা।

অনেকগুলো করে কামরা একেকটি তলায়। খালি দেখে তারই একটায় সমিতি উঠতে বলেছে সাইমনকে।

থমথমে মুখ নিয়ে উদয় হলেন শমেত। তাঁর ধারণা, এই চেহারা দেখে পিলে চমকে যাবে সাইমনের।

'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! বল্, ডফিনকে কোথায় রেখেছিস?'

'কি যা তা কথা বলছেন?' সাইমন সাধু সাজল। 'ডফিনের খবর আমি কি জানি? টেম্পলে খুঁজুনগে যান।'

'টেম্পলে খুঁজব, না? ন্যাকা!' ফুঁসে ওঠেন শমেত। 'দাঁড়া, তোকে গিলোটিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

সাইমনও পাল্টা ফোঁস করে উঠল।

'গিলোটিনে কেউ গেলে আপনি যাবেন। আমি কাল সদস্যদের হাতে ডফিনকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। তারা প্রত্যেকে খাতায় সই করেছে। ওর ব্যাপারে আমার আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আপনি আমাকে ভয় দেখাতে আসবেন না। বরং ওই চার সদস্যের কাছে গিয়ে রাজপুত্রের খোঁজ করুনগে। তারাই ভাল বলতে পারবে ও কোথায় আছে। তাদের ওপর চোটপাট করুনগে যান।'

মুখ কাঁচুমাচু করে লা স্যালের কাছে ফিরে এলেন শমেত।

'স্রেফ চেপে যান,' বুদ্ধি দিল লা স্যাল। 'আর বুকে সাহস রাখুন। কেননা, সাইমনই বলুন আর ওই চার সদস্যই বলুন, কেউ দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনবে ওরা, নিজেরাই ফেঁসে যাবে না? আপনি চুপচাপ থাকুন, দেখবেন ওরাও মুখে তালা এঁটে রাখছে।'

'তাহলে কি ওই নকল ছেলেটাকেই ডফিন বলে চালিয়ে যেতে হবে?'

'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কি দরকার আগ বাড়িয়ে খোঁচাখুঁচি করতে

যাওয়ার?'

শমেত টলমল পায়ে বেরিয়ে এলেন। দশ-বিশ লাখ মোহর দূরে থাক, এখন মাথাটা বাঁচলে হয়। রোবেসপিয়েরের কানে একবার খবরটা পৌঁছলে আর রক্ষে থাকবে না। শমেতকে ফাঁসাতে ওই লা স্যাল লোকটা নিজেই বলে দেবে না তো? ও তো দিব্যি কুবুদ্ধি দিয়ে খালাস, কিন্তু অন্যরা তো সরাসরি জড়িত রয়েছে ঘটনার সাথে। আর লা স্যালই যে ডফিনকে চুরির বুদ্ধি দিয়েছিল তার প্রমাণ কোথায়? শমেত বললেই লোকে তা মেনে নেবে কেন?

লা স্যাল এখন সাইমনের অপেক্ষায় রয়েছে। সে যে কোন সময় এসে পড়বে। সাইমন অবশ্য একটা দিন দেরি করে এল। শমেত যদি গোয়েন্দা লাগান, সে কোথায় যায় না যায় জানার জন্যে–সেই ভয়ে। লা স্যালের সঙ্গে ওর যে যোগাযোগ আছে সেটা যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে। নইলে লা স্যালকে চাপ দিলেই রাজপুত্রের হদিস বেরিয়ে পড়বে। তারপর আর দেখতে হবে না। সাইমন, তার স্ত্রী, লা স্যাল, নিরাপত্তা সমিতির চার সদস্য সবার প্রাণ যাবে গিলোটিনে।

লা স্যাল তৈরি ছিল, সাইমন যখন এল, তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাল।

'কি খবর বলো,' হাসি মুখে বলল লা স্যাল।

বিরক্তি বোধ করল সাইমন।

'খবর তো তোমার কাছে,' বলল সে ঈষৎ ক্ষোভের সুরে। আর ক্ষোভ হবে না-ই বা কেন? রাজপুত্র এখন কোথায়, সে রাতে লা স্যালের কোন বিপদ হয়েছিল কিনা, তার ওপর পুরস্কারের টাকাটা কবে নাগাদ হাতে আসছে এসব খবর জানতে মনটা ছটফট করে না মানুষের?

লা স্যাল টাকার কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল।

'তুমি দেখছি ঠাট্টাও বোঝো না,' হাসি থামিয়ে বলল ও।

'মানে?' সাইমন হতভম্ব। 'ডফিনকে পেলে ওর মামা দশ-বিশ লাখ মোহর দিয়ে দেবেন বলোনি তুমি? আমাকে লোভ দেখিয়ে ওকে পাচার করে আনোনি?' গর্জে উঠল সাইমন। 'বাজে কথা ছাড়ো। টাকা কবে দিচ্ছ শিগ্‌গির বলো।'

'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি তো,' লা স্যাল সবিস্ময়ে বলল। 'তোমার-আমার মত লোকের পক্ষে কি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা সাজে? ধরে নাও ঠাট্টা করেছিলাম, আমাকে মাফ করে দাও।'

'তবে রে,' বলে গর্জে উঠল সাইমন, লাফ দিল লা স্যালের উদ্দেশে। লা স্যাল সামান্য সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা লাঠিখানা ছোঁ মেরে তুলে নিল। লাঠিটা সাইমনের দিকে বাগিয়ে ধরতে সে ওটা ধরে টান দিল সজোরে। দেখা গেল, মুহূর্তে লাঠিটা খসে চলে এসেছে সাইমনের হাতে।

লা স্যালের হাতে ঝিকিয়ে উঠল লাঠির ভেতরকার সরু, লিকলিকে কিরিচটা। ওটার ডগা বুক স্পর্শ করেছে সাইমনের।

'ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও, বন্ধু,' শান্ত কণ্ঠে বলল লা স্যাল। 'নইলে গিলোটিন ছাড়া গতি থাকবে না।'

পাঁচ

এরপর কেটে গেছে একটি বছর।

ইতোমধ্যে গিলোটিনে মাথা কাটা গেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রোবেসপিয়েরের। যাঁর কূটবুদ্ধির ফলে এ অসাধ্য সাধন হয়েছে তিনি সেই ফোকে-গণিতের অধ্যাপক, চালোঁর প্রশাসক।

এ ছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। টেম্পল কারাগারে মারা গেছে রাজপুত্র ডফিনের বদলী সেই বোবা-কালা বস্তীর ছেলেটি। তার মৃত্যু-রহস্য অনেককেই ভাবিয়ে তোলে। কিভাবে মারা গেছে ছেলেটি, অসুখে নাকি বিষপ্রয়োগের ফলে, কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। তাড়াহুড়ো করে রটিয়ে দেয়া হয় রাজপুত্র মারা গেছে এবং তাকে কঠোর নিরাপত্তায় দাফন করা হয় নটরডেম সংলগ্ন কবরস্থানে।

রাজপুত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করতে পেরে যেন ভারী পাথর নেমে গেল নিরাপত্তা সমিতির সদস্যদের বুকের ওপর থেকে।

রাজপুত্রের অন্তর্ধানের বিষয়টি আর ধামাচাপা থাকছিল না, প্রকাশ হয়ে পড়ছিল কিভাবে কিভাবে। বোবা-কালা ছেলেটি যে আসল রাজপুত্র নয়, সই করে বুঝে নেয়া সেই চার সদস্য কিন্তু শীঘ্রিই বিষয়টা ধরে ফেলেন। কেননা, রানীর বিচারের সময় লম্বা জবানবন্দী দিয়েছিল রাজপুত্র। তাঁরা তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন। আর সেই একই রাজপুত্র কিনা পরে দেখা গেল কথাও বলতে পারে না, কানেও শোনে না।

সদস্যরা নিরাপত্তা সমিতিকে জানিয়েছেন কথাটা। শমেতের অগোচরে তদন্তও চলছে। অনেকেই এখন তাঁকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। সেজন্যে অবশ্য তাঁদেরকে দোষও দেয়া যায় না। কারণ, এই শমেতই তো সাইমনকে বরখাস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এদিকে শমেত বেচারা পড়েছেন মহা ফাঁপরে। ভেবেছিলেন কি আর হলো কি। তাঁর ধারণা ছিল, দু'একদিন সময় পেলেই রাজপুত্র ডফিনকে নিয়ে তিনি

সুইটজারল্যান্ড পাড়ি জমাবেন। অথচ...

পরিকল্পনায় তো কোন ফাঁক ছিল না। কিন্তু সাইমন যে অমন বেঈমানীটা করবে কে জানত। চাকরিচ্যুতির নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে সে বিদায়কালে ডফিনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে।

টেম্পল কারাগারে যে আসল রাজপুত্র নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত এখন জননিরাপত্তা সমিতি। তলে তলে খোঁজ-খবর চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদেরকে অবশ্য গোপন রাখতে হচ্ছে রাজপুত্রের অন্তর্ধান সংবাদ। কেননা, রাজপুত্র মুক্ত ও জীবিত রয়েছে জানাজানি হয়ে গেলে চুপ করে বসে থাকবে না রাজতন্ত্রীরা। তাকে ঘিরে সংগঠিত হতে থাকবে। সেজন্যেই এত গোপনীয়তা।

ওদিকে নকল ছেলেটি মারা গেলে তাড়াহুড়ো করে তাকে কবর তো দেয়া হলোই, ফালতু এক অভিযোগ এনে শমেতকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। এর কিছুদিন পর সাইমনকেও ফাঁসিয়ে দেয়া হলো—যার পরিণতি গিলোটিনে মৃত্যু। ফলে, সাইমন টেম্পল কারাগার ত্যাগের আগে-পরে যেসব রহস্যময় ঘটনা ঘটেছিল সবই চাপা পড়ে গেল, সাক্ষী-প্রমাণ বলতে কিছুই থাকল না।

ইতোমধ্যে, রাজতন্ত্রীরা দ্য বাজের কাছ থেকে ইশারায়-ইঙ্গিতে জেনেছেন রাজপুত্র বেঁচে আছে এবং মুক্ত অবস্থায় আছে এবং যথাসময়ে দেখা দেবে। দ্য বাজ তাঁদেরকে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলেছেন। কিন্তু সবাই তো আর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেন না। তাঁদের কারও কারও অসংযত আচরণ লক্ষ করে সন্দিহান হয়ে উঠল সাধারণতন্ত্রীরা। ক্রমেই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকল তাদের। রাজপুত্রের বয়সী লালচুলো কোন বালক ফ্রান্সের কোন শহরে কিংবা গাঁয়ে, খামারে কিংবা অরণ্যে অন্যখান থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে কিনা খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হয়ে গেল।

বোবোঁপন্থীদের পেছনে লেগে গেল গোয়েন্দা। তাঁদের চাকর-বাকর, কর্মচারী, প্রতিবেশীদের দরাজ হাতে ঘুষ দিচ্ছে বিপ্লবীরা, লালচুলো কোন ছেলেকে তাঁদের কারও বাড়িতে দেখলেই যেন খবর পৌঁছে দেয় নেতাদের কাছে।

অবশেষে খবর একদিন পৌঁছল।

মিউডন শহরে বাস করেন ব্যাঙ্কার পেটিভ্যাল। তাঁর বাড়িতে নাকি দশ মাস আগে ওরকম এক ছেলে এসেছে।

ছেলেটির বয়স দশের আশপাশে। লাল চুল কাঁধ ছুঁয়েছে। সে নাকি পেটিভ্যালের দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। মা-বাবা হঠাৎই মারা যাওয়াতে এতিম বালকটিকে ভদ্রলোক নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে।

অতশত এখন বিবেচনা করতে নারাজ বিপ্লবী সরকার। তারা প্যারিস থেকে শীঘ্রিই পুলিস পাঠাতে মনস্থ করল।

এদিকে, দ্য বাজও কিন্তু বসে নেই। সবদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে তাঁর।

পরিকল্পনার প্রথমদিকে ইচ্ছে ছিল, ব্যারন ইনেজ যথাশীঘ্র সপ্তদশ লুই, অর্থাৎ রাজপুত্র ডফিনকে নিয়ে ফ্রান্স ত্যাগ করবেন। রাজপুত্র টেম্পল কারায় আটক থাকার সময় থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তাকে সপ্তদশ লুই বলে অভিহিত করছে। কাজেই, বিপ্লবী সরকার তার মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিতে ইংল্যান্ডে পলাতক কাউন্ট অভ প্রভেন্স নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করলেন। ইনি ডফিনের চাচা। কাউন্ট অভ প্রভেন্স নিজের নাম রাখলেন অষ্টাদশ লুই, সপ্তদশ নয়।

দ্য বাজ চেয়েছিলেন ডফিনকে প্রথম সুযোগেই ব্র্যান্ডেনবুর্গে পাঠাবেন, প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডরিকের আশ্রয়ে। কিন্তু বিধি বাম। প্রুশিয়ার রাজনৈতিক হাওয়া হঠাৎই বইতে লাগল উল্টোমুখো। সম্রাট বলে পাঠালেন, ডফিনের প্রুশিয়া যাওয়া এখন ঠিক হবে না।

অগত্যা, ব্যারন ইনেজকে ফিরে যেতে হলো দেশে। রাজপুত্রকে পেটিভ্যালের আশ্রয়ে রেখে গেলেন তিনি। এরপর গড়িয়ে গেল মাসের পর মাস।

দ্য বাজ বিষয়টা পছন্দ করতে পারছেন না। তিনি টের পাচ্ছেন, ডফিনের জন্যে মারাত্মক হয়ে উঠছে এই কালবিলম্ব। তিনি তাগাদা দিয়ে পাঠালেন প্রুশিয়ায়।

'সপ্তদশ লুইয়ের প্রুশিয়া যাওয়ার ব্যাপারে এখনও যদি কোন বাধা থেকে থাকে, তবে সে পরিকল্পনা বাতিল করাই শ্রেয়। ফ্রান্স তার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। আমি কি প্রুশিয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে তাকে অন্য কোন দেশে পাঠানো যায় কিনা দেখব?'

এতদিনে সম্রাটের টনক নড়ল। ওয়াদার বরখেলাপ তো করা যায় না। লুইকে আশ্রয় দেয়ার কথা বলে এখন পিছিয়ে এলে দেশে-বিদেশে দুর্নাম রটে যাবে।

কাজেই, নিজের সমস্ত অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে ব্যারন ইনেজকে আবার পাঠিয়ে দিলেন ফ্রান্সে। ব্যারন এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন সপ্তদশ লুইকে।

ব্যারন একা এসেছেন প্রুশিয়া থেকে, কিন্তু ফেরার সময় তিনি একজন সহকারী চান। কাজটা যেহেতু ভয়ানক বিপজ্জনক, সেজন্যে তাঁর মনে ধরেছে লা স্যালকে। তাকেই সঙ্গী হিসেবে চান তিনি। গতবার এসে লা স্যালের কর্মদক্ষতা ও চাতুর্য তো তিনি নিজের চোখেই দেখে গেছেন।

ওদিকে, লা স্যাল ছবি এঁকে আজকাল বেশ ভালই আছে। ধীরে ধীরে সুনাম বাড়ছে তার, ফলে বাড়ছে কাজের পরিমাণও। এখন আর ছেঁড়া জুতো পরতে হচ্ছে না তাকে, অভাব হচ্ছে না দাড়ি কামাবার গরম পানিরও।

কপালটাও ভাল বলতে হবে তার। রাজপুত্র ডফিনের রহস্যময় অন্তর্ধান ঘটনায় এর-ওর মাথা কাটা গেলেও কেউ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি লা স্যালকে। সে কি এই নিশ্চিন্ত-নির্বিঘ্ন জীবন ছেড়ে অতবড় ঝুঁকি নিতে যাবে? দ্য বাজের কিন্তু ঘোর সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে।

দ্য বাজের সন্দেহের কারণ যে নেই তাও নয়। কেননা, লা স্যাল মনেপ্রাণে বোর্বোঁপন্থী নয়। সে সুবিধাবাদী লোক। এ ধরনের লোকের কাছ থেকে কতটুকু দেশপ্রেমই বা আশা করা যায়?

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই লোক কেন গিয়েছিল জীবনবাজি রেখে ডফিনকে উদ্ধার করে আনতে? অনেকটা বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল তাকে। দ্য বাজের দয়া ছাড়া তখন দিন চলত না, ফলে তাঁর কথা না শুনে উপায় কি? কাজটা হাতে নেয়ার পর অবশ্য বুদ্ধির খেলায় বিপ্লবীদের হারিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটাও কাজ করছিল তার ভেতর। পরে কিন্তু ডফিন হাতছাড়া হয়ে গেলে সমস্ত উৎসাহ নিভে যায় তার।

ব্যারন খুব চাইছেন লা স্যালকে। কিন্তু দ্য বাজ কি পারবেন যুবকটিকে আবারও উৎসাহী করে তুলতে?

সাত-পাঁচ ভেবে দ্য বাজ ডেকে পাঠালেন লা স্যালকে।

'লা স্যাল, তুমি যে অতবড় ঝুঁকি নিয়ে ডফিনকে বের করে আনলে সব কিন্তু এখন ভেস্তে যেতে বসেছে। বিপ্লবীরা ওকে ধরতে পারলে কিন্তু আর জেলে দেবে না। ওর মৃত্যু সংবাদ যেহেতু রটানো হয়েছে, এবার ওকে হাতে পাওয়া মাত্র জানে মেরে ফেলবে। ওরা যে আগেরবার মিথ্যে রটিয়েছিল সেটা মানুষকে বুঝতে দেবে না,' বললেন তিনি।

লা স্যাল সব শোনার পরও উৎসাহ দেখাল না।

'তো আমি কি করব?'

'তোমাকে আবার জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। রাজার জন্যে না হোক, আমার জন্যে।' কথাগুলো বলার পরক্ষণেই লজ্জিত হাসি ফুটে উঠল দ্য বাজের মুখে। 'কেমন বোকার মত কথা বলছি, না? তোমার কাছে এতবড় দাবি করার কি অধিকার আছে আমার?'

প্রস্তাবটা ভাবনায় ফেলে দিল লা স্যালকে। ডফিনকে প্রথমবার সে উদ্ধার করে আনে। কথাটা নিশ্চয়ই জেনে গেছে রাজপুত্র। কিংবা এখনও জেনে না থাকলেও ভবিষ্যতে জানবে। আর তার এবারকার কাজ হবে ভবিষ্যৎ রাজাকে ফ্রান্স থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়া। ডফিন নিশ্চয়ই চোখ বুজে থাকবে না, কে তার জন্যে কতটুকু আত্মত্যাগ করল নিশ্চয়ই মনে রাখবে। ভবিষ্যতে সে যখন ক্ষমতায় বসবে, মূল্যায়ন কি করবে না লা স্যালের? দু'দু'বার যে লোকটি

নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাকে কি দেখবে না?

কে জানে, এ ছেলে কোনদিনই হয়তো সিংহাসনে বসতে পারবে না। তার আগেই হয়তো গুপ্তঘাতকের হাতে মারা পড়বে। কিংবা সিংহাসনে বসলেই বা, দুর্দিনের বন্ধুকে ভুলে যেতে কতক্ষণ লাগে রাজ-রাজড়াদের? এসব চিন্তাও খেলা করছে লা স্যালের মাথায়।

তারপরও আশা ছাড়তে পারছে না লা স্যাল। রাজপুত্র একবার যদি সিংহাসনে বসেই পড়ে, হয়তো মন্ত্রী না বানিয়ে ছাড়বে না ওকে। দু'দু'বার সে জীবনবাজি রেখে তাকে উদ্ধার করে আনেনি?

বেশ, এটুকু আশার আলোই যথেষ্ট আমার জন্যে, ভাবল লা স্যাল। সে তো আর ছবি এঁকে র‍্যাফেল বা টিশিয়ান হতে পারবে না। অতটা আত্মবিশ্বাসী হতে পারলে তো কথাই ছিল না।

আর মৃত্যুভয়? প্যারিসে বাস করে ও ভয় করা নির্বুদ্ধিতা বই কিছু নয়। সামান্য অপরাধে গিলোটিনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে না মানুষ? লা স্যালও হত, বেঁচে গেছে স্রেফ বুদ্ধি ও ভাগ্যের বলে। বুদ্ধি এখনও ধারাল রয়েছে তার, আর ভাগ্য সঙ্গ ছেড়ে গেছে এমন মনে করারও কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। কাজেই···

দ্য বাজের প্রস্তাবে সায় দিল লা স্যাল। মিউডনের উদ্দেশে রওনা হলো সে।

লা স্যালের জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছেন ব্যারন ইনেজ। পাসপোর্টও চাই। কিন্তু কোত্থেকে জোগাড় হবে পাসপোর্ট? দ্য বাজ হয়তো জাল করবেন। এ কারবারে তো রীতিমত সিদ্ধহস্ত তিনি। টাকা জাল করতে পারেন আর তিনটে পাসপোর্ট করতে পারবেন না, এ কখনও হয়?

পাসপোর্ট নিয়ে এল লা স্যাল। ওতে ব্যারন ইনেজের নাম লেখা হয়েছে মীনহিয়ার হ্যাগেনব্যাক। সপ্তদশ লুই তাঁর ভাতিজা, আর লা স্যালের নাম পাল্টে হয়েছে মঁসিয়ে হুজন।

সুইটজারল্যান্ডে চকোলেট কারখানা আছে হ্যাগেনব্যাকের। তিনি ব্রাসেলসে যাচ্ছেন। আর হুজনও ব্যবসায়ী, তবে মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওঁরা যাবেন কোন্ দিক দিয়ে? সহজ পথ একটা আছে বটে রাইন উপত্যকার মধ্য দিয়ে। পেটিভ্যাল কিন্তু ওপথে যেতে বারণ করলেন। ফরাসি সেনাবাহিনী নিয়মিত যাতায়াত করে ওখান দিয়ে। পর্যটক দেখলেই হলো, কাগজ দেখাও, পাসপোর্ট দেখাও–নানা ঝক্কি-ঝামেলা। কাজেই ওপথ বন্ধ।

আরেকটি রাস্তা আছে জেনেভার ভেতর দিয়ে। মার্টিন লেবাস নামে এক কট্টর রাজভক্ত ফরাসি বাস করে জেনেভায়। সে সব ধরনের সাহায্য করবে।

জেনেভা থেকে নিউশ্যাটল, বেইল এবং পরে ব্ল্যাক ফরেস্ট পেরিয়ে প্রুশিয়া। অনেকখানি রাস্তা, কিন্তু নিরাপদ। বিপদের আশঙ্কা যেটা রয়েছে তা ওই জেনেভা পর্যন্তই।

অভিযাত্রীরা রওনা হয়ে গেলেন চার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে। জেনেভা অবধি যাবে গাড়ি।

কপাল নিতান্তই ভাল বলতে হবে তাঁদের। কারণ, ওঁরা রওনা হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই পেটিভ্যালের বাড়িতে হানা দিল পুলিস; স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে। কে তিনি? তিনি আর কেউ নন, সেই মঁসিয়ে ফোকে–গণিতের সাবেক অধ্যাপক এবং চালোঁর প্রশাসক। ডফিনকে অপহরণ করার পরিকল্পনা আঁটছেন বলে গুজব ছড়িয়েছিল যাঁকে নিয়ে।

অল্পের জন্যে এ যাত্রা ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল সপ্তদশ লুই।

ফোকে এতদিন ধরে চেষ্টা করে এসেছেন সপ্তদশ লুইয়ের হদিস বের করার জন্যে। চেষ্টার ফলও পেলেন, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। তিনি এসে শুনলেন পেটিভ্যালের ভাগ্নে মামার বাসা ছেড়ে চলে গেছে।

পেটিভ্যাল সাদর আমন্ত্রণ জানালেন ফোকেকে। ফোকে কিন্তু কালবিলম্ব না করে কাজের কথা পাড়লেন।

'আপনার ভাগ্নে বলে যাকে পরিচয় দেন, সে ছেলেটি কোথায়?'

পেটিভ্যাল মোটেই ঘাবড়ালেন না।

'ছেলেটি আমার ভাগ্নে, তাই ভাগ্নে বলে পরিচয় দিই,' বলে শুরু করলেন পেটিভ্যাল। 'গতকাল সে ব্রাসেলস রওনা হয়ে গেছে। ওখানে আমার বোন, মানে তার খালার কাছে কিছুদিন থাকবে।'

'সে গেছে কোন্ পথে?'

মুহূর্তে পেটিভ্যালের মুখ-চোখ কঠিন হয়ে গেল।

'দেখুন, মন্ত্রী সাহেব, আপনি কেন তাকে খুঁজছেন জানি না। কিন্তু তাকে আপনি ধরতে বেরোবেন আর আমি গড়গড় করে সব বলে দেব তেমন মামা আমি নই।'

দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল যেন ফোকের।

'আপনি কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা করছেন। জানেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা কি?'

তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন পেটিভ্যাল।

'তবে আপনিও জেনে রাখুন, মন্ত্রী সাহেব, আমাকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার বোধহয় জানা নেই, জননিরাপত্তা সমিতির হর্তা-কর্তারা টাকা ধারে এই অধম ব্যাঙ্কারের কাছে। যদি আইনের আশ্রয় নিই, বিপ্লবী নেতাদের আমি জেলে পুরতে পারি, তা জানেন?'

জানেন না মানে? খুব ভাল করেই জানেন ফোকে। মিউডন শহরের এই ব্যাঙ্কারটি যে বিপ্লবী নেতাদের পেয়ারের বান্দা তা কে-ই বা না জানে। আর সব কিছুর মূলে রয়েছে অর্থ। শুধু অ্যাসাইনাট ছেপে কি দেশ চলে? নিরাপত্তা সমিতি আপদে-বিপদে যখনই হাত পেতেছে, অকাতরে সোনা জুগিয়ে গেছেন পেটিভ্যাল।

প্রচুর ধনী ব্যাঙ্কার রয়েছেন প্যারিসে, কিন্তু বিপ্লবের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ নন। কাজেই সমিতিকে সোনা জোগাতে যাবেন কি কারণে? পেটিভ্যালই একমাত্র ব্যক্তি, সাহস করে যিনি ধার দিয়ে চলেছেন–টাকা আদায় হবে কিনা সে চিন্তা না করেই। কেন? অবশ্যই স্বার্থ। নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই। কট্টর রাজতন্ত্রী তিনি এবং সে সঙ্গে সক্রিয়ও বটে। রাজভক্তদের রয়েছে তাঁর প্রতি অগাধ আস্থা। সে কারণেই দ্য বাজ ডফিনকে তুলে দেন তাঁর হাতে।

বোর্বোঁপন্থীদের নানাভাবে সাহায্য করেন পেটিভ্যাল, তা কি আর জানে না নিরাপত্তা সমিতি? খুব জানে। কিন্তু জেনেশুনেও চুপ করে থাকে।

ফোকেও বিলক্ষণ জানেন। তাই পেটিভ্যালের ধমক খেয়ে তিনি চুপসে যেতে বাধ্য হলেন। শুধু তাই নয়, পেটিভ্যালের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে যে সমর্থন পাবেন না নিজের লোকেদের কাছ থেকে এ-ও তাঁর জানা।

মরুকগে পেটিভ্যাল, ভাবলেন ফোকে। আসল কাজ এখন রাজপুত্রকে গ্রেপ্তার করা। ফ্রান্স থেকে উত্তরদিকে বেরোতে হলে দুটি মাত্র পথ রয়েছে–রাইন উপত্যকা ও জেনেভা। রাইন উপত্যকায় বরাবরই কঠোর পাহারার ব্যবস্থা আছে। ওখানে একজন মাত্র অশ্বারোহী দূত পাঠালেই চলবে। সে শুধু খবর পৌঁছে দেবে, ডফিন এপথে পালানোর চেষ্টা করতে পারে। বাকিটা দেখার জন্যে সেনাবাহিনী তো রয়েছেই।

ফোকের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলো জেনেভার দিকে। প্যারিসে জরুরী কাজ না থাকলে নিজেই ছুটতেন ও পথে। অবশ্য ক্ষতি নেই। যোগ্য লোক আছে তাঁর হাতে। ডেমারেত তার নাম। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন ফোকে জেনেভামুখী পথের উদ্দেশে। তার সঙ্গে রয়েছে অভিজ্ঞ তিন পুলিসকর্মী। শিকারের পেছনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ছুটল তারা।

ছয়

প্রাকৃতিক শোভার কোন তুলনা নেই। পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথ। রাস্তার পাশে কখনও পাইন বন, আবার কখনও বা স্বচ্ছ, নীল পানি টেটন্বুর হ্রদ। বুনো ফুলের সুঘ্রাণে বুক জুড়িয়ে যায়, মাথার ওপরে পাখির গান–এসবই উপভোগ করতে করতে পথ চলেছে ফোকে সাহেবের শিকার।

ওরা তিনজন কিন্তু নিশ্চিন্তে রয়েছে। পেছনে যে পুলিস লেগেছে খবর পায়নি। যখনই খিদে পাচ্ছে কোন সরাইখানায় থেমে খেয়ে নিচ্ছে। রাত নামলে মাথা গুঁজছে কোন হোটেলে। বেশ গদাইলশ্করি চালে চলেছে তারা।

ডেমারেত কিন্তু মরিয়ার মত পিছু নিয়েছে ওদের। ফলে, অক্সেয়ারের হোটেল থেকে লা স্যালদের গাড়ি সকাল দশটার দিকে যখন বেরোল, ডেমারেত তখন মাত্র মাইল পাঁচেক পেছনে।

এদিকে, লা স্যাল ও ব্যারন ইনেজ ঠিক করেছেন, সারাদিন গাড়িতে বন্দী না থেকে তাঁরা পালা করে ঘোড়ায় চেপে পথ চলবেন। ডফিনের কথা অবশ্য আলাদা, সে ছেলেমানুষ।

ইনেজ লুই ছুঁড়ে টস করেছেন। জিত হলো লা স্যালের। তারমানে ঘোড়ায় প্রথম সে-ই চড়বে। ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। ঘোড়া ভাড়া করে দেয় পোস্টমাস্টার। সে লোক তখনও এসে পৌঁছেনি।

সরাইয়ের পাশেই পোস্ট অফিস। লা স্যাল ইনেজ ও ডফিনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পোস্টমাস্টারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'আপনি কোন চিন্তা করবেন না,' ইনেজকে আশ্বস্ত করেছে সে। 'আমি ঘোড়া ছুটিয়ে আপনাদের ঠিক ধরে ফেলব।'

ইতোমধ্যে পোস্টমাস্টার চলে এসেছে। ঘোড়ার কথা তাকে বলাও হয়েছে। শীঘ্রি হাজির হয়ে যাবে ঘোড়া।

হঠাৎই রাস্তায় ধুলোর ঝড় উঠতে দেখল লা স্যাল। সে তখন পোস্ট অফিসের দরজার সামনে পায়চারি করছে। ধুলোর মেঘ ভেদ করে সহসা উদয় হলো ক'জন ঘোড়সওয়ার।

লা স্যাল অবাক হয়ে গেল। এরকম নির্জন, শান্তিময় পাহাড়ী এলাকায় হঠাৎ এত বিক্রম দেখানোর কি প্রয়োজন পড়ল? ও কিন্তু তখন অবধি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, এই চার অশ্বারোহীর সবেগে হানা দেয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থেকে

থাকতে পারে।

অশ্বারোহীরা লাগাম টেনে ধরল সরাইয়ের সামনে। নতুন খদ্দের এসেছে ভেবে সরাই মালিক আপ্যায়ন করতে ছুটে এল।

'ওহে, তোমার সরাইখানায় আজ-কালের মধ্যে তিনজন লোক এসেছিল চার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে?' ব্যস্ততার সুরে শুধাল ডেমারেত। 'গাড়িটার রং লাল-সাদা।'

সরাইওয়ালা জানাল, কাল সন্ধেবেলা এসেছিল দু'জন পুরুষ আর একটি কিশোর, তারা রাতটা কাটিয়ে, আজ সকালে এই আধ ঘণ্টা খানেক হয় বেরিয়ে গেছে।

জবাব শুনে খুশি হয়ে উঠল ডেমারেত।

'মাত্র আধ ঘণ্টা?' বলল সে। 'তবে আর চিন্তা কি? আমরাও নাস্তাটা সেরে নিই, ঘোড়াগুলোর পেটেও কিছু দানা-পানি পড়ুক। ওদেরকে ধরতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। কি বলো তোমরা?'

সঙ্গীরা দ্বিমত করল না।

'ঘোড়ার সাথে কি আর গাড়ি পারে?' সবার হয়ে মত প্রকাশ করল একজন।

ওদের কথা-বার্তা শুনে লা স্যালের বুক ঢিব-ঢিব, ডাকঘরের দরজার পেছনে আড়াল নিয়েছে সে। তাকে কিন্তু ডেমারেতরা কিংবা সরাইওয়ালা কেউই দেখতে পায়নি। সরাইওয়ালা ভাগ্যিস লক্ষ করেনি, করলে সোজা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিত, 'ওই যে, ওদের একজন এখনও আছে!'

ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে লা স্যাল। এরা যে বিপ্লবী সরকারের লোক, সপ্তদশ লুইকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর।

সম্ভবত দ্য বাজও জানতেন না, নিরাপত্তা সমিতি জেনে গেছে মিউডনে রয়েছে রাজপুত্র। জানলে নিশ্চয়ই তাগিদ দিতেন চোখের পলকে মিউডন থেকে জেনেভা পর্যন্ত রাস্তাটুকু পাড়ি দিতে। পুলিস পেছনে লেগেছে জানলে কি আর এত ঢিমেতালে চলত লা স্যালেরা! এতক্ষণে নিরাপদে জেনেভা পৌঁছে যেত তারা।

এসব সাত-পাঁচ ভাবছে, এরইমধ্যে ঘোড়া এসে গেল। মুহূর্তে ওটার পিঠে চেপে বসল লা স্যাল। ডেমারেতরা ততক্ষণে সরাইয়ের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তারা জানতেও পারল না অল্পের জন্যে পলাতকদের একজন তাদের হাত ফসকে গেল।

লা স্যালের ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। ওটার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলে যাচ্ছে তার মগজ। পুলিস বাহিনীর ঘোড়াগুলো রীতিমত তেজী জানোয়ার। দানা-পানি পেটে পড়লে আরও চাঙা হয়ে উঠবে, তারপর ডফিনের গাড়িখানাকে

পাকড়াও করতে ওদের এক ঘণ্টাও লাগবে না।

এখন কি উপায়?

লা স্যাল পেছনে ভেঁপুর শব্দ শুনতে পেল। জেনেভার ডাকগাড়ি আসছে। রোজ একটি করে সরকারী ডাকগাড়ি জেনেভা যাওয়া-আসা করে। পথে নামার পর থেকে প্রতিদিনই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে লা স্যাল।

আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়–চিন্তা খেলে গেল লা স্যালের মাথায়। এই ডাকগাড়িতে শুধু যে ডাক যায় তা নয়, যাত্রীরাও ওঠে।

আর কালবিলম্ব নয়, পক্ষীরাজের মত উড়িয়ে নিয়ে চলল লা স্যাল তার ঘোড়াটিকে। খানিক পরেই পেছনে ঘোড়ার খুরের খট-খট শব্দ শুনে গাড়ি থামাতে বললেন ব্যারন ইনেজ।

লা স্যাল সংক্ষেপে তাঁকে সব কথা খুলে বলল।

'পেছনে পুলিস লেগেছে। শিগ্‌গিরি এসে পড়বে।'

ব্যারন ইনেজের গাড়ির চালক পেটিভ্যালের অনুগত লোক। তার কাছে কোন কথা লুকানোর মানে হয় না। আর বিশেষ করে ডফিনকে বাঁচাতে হলে এমুহূর্তে তার সাহায্যও পুরোমাত্রায় প্রয়োজন হবে।

ব্যারন ইনেজ সব শুনে নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলেন। তাঁর ঢিলেঢালা ভাবের জন্যেই এতবড় বিপদের মুখে পড়তে চলেছে সপ্তদশ লুই। তিনি একটু সতর্ক থাকলে সেই কখন তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারতেন।

'কি করব,' বললেন তিনি, 'ওকে নিয়ে পাহাড়ে লুকাব?'

'তাতে লাভ হবে না,' বলল লা স্যাল। 'খালি গাড়ি দেখেই ওরা যা বোঝার বুঝে নেবে, এবং পাহাড়ে তল্লাশী চালিয়ে খুঁজেও বের করে ফেলবে আমাদের। উঁহুঁ, পাহাড়ে লুকানো যাবে না। এক কাজ করুন, গাড়ি থেকে জল নেমে পড়ুন। দেখি, কোন উপায় করতে পারি কিনা।'

সপ্তদশ লুই গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'আমি কিছুতেই ধরা দেব না। লা স্যাল, আমাকে যদি আপনি রাজা মানেন, তাহলে আমার আদেশ থাকল–ধরা পড়া নিশ্চিত বুঝলে আপনি কিন্তু আমার বুকে ছুরি বসাবেন।'

তাজ্জব বনে গেল লা স্যাল। রাজপুত্রের এত পরিবর্তন! এই ডফিনই ব্র্যান্ডি পান করে করে জড়বুদ্ধি বালকে পরিণত হয়েছিল, নিজের গর্ভধারিণীকে গিলোটিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল?

ব্র্যান্ডি বর্জন ও মিউডনের শান্ত পরিবেশে সাদাসিধে জীবন যাপনের ফলে মস্ত পরিবর্তন ঘটে গেছে রাজপুত্রের মধ্যে। সে এখন এক দৃঢ়চেতা রাজপুরুষ।

লা স্যাল আনন্দিত হয়ে উঠল।

'মহারাজ, আপনার আদেশ আমার মনে থাকবে,' সবিনয়ে বলল ও। 'তবে

আশা করি ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকবেন, আপনাকে নিয়ে নিরাপদে জেনেভায় চলে যেতে পারব।'

এসময় ভেঁপুর শব্দ শোনা গেল। কাছে এসে পড়েছে।

'মহারাজ, ওই যে কোচ আসছে,' বলল লা স্যাল। 'ওই কোচই দেখবেন আপনাকে বাঁচাবে।··· কোচোয়ান ভায়া, তুমি গাড়িটাকে রাস্তার ওপাশে নিয়ে যাও। কাত করে দাঁড় করিয়ে রাখো। আর আমার কথাগুলো কান খাড়া করে শুনবে। প্রয়োজন মত সায় দিতে হবে।'

এবার ইনেজের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিল লা স্যাল।

'জেনেভা পৌঁছতে আমার দেরি হতে পারে,' জানাল লা স্যাল। 'লেবাসের বাড়িতে আমার জন্যে বড়জোর একদিন অপেক্ষা করবেন। তারপর মহারাজকে নিয়ে লেক লেম্যান পেরিয়ে চলে যাবেন। জেনেভা সীমান্তের এতটাই কাছে যে মোটেই নিরাপদ নয়। ফরাসি পুলিস নাকি প্রায়ই অনুপ্রবেশ করে ওখানে, জোর করে পলাতকদের ধরে নিয়ে আসে।'

কথা বলার ফাঁকে ডাকগাড়ি এসে পড়ল। প্রায় বিশ ফিট লম্বা গাড়ি, দোতলার মত খানিকটা জায়গা রয়েছে। আট ঘোড়ায় টানা গাড়িখানায় যাত্রীর সংখ্যা প্রচুর। রাস্তার মাঝখানে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জোরে জোরে ভেঁপু বাজাতে লাগল।

এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে রয়েছে, অন্য হাতটা তুলে লা স্যাল গাড়িটিকে থামতে ইশারা করল।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় বলে এসব কোচের চালকদের মেজাজ থাকে খাপ্পা।

'কী, ব্যাপারটা কি বলুন তো?' রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল চালক।

'ব্যাপার কিছু নয়, সিটিজেন,' নরম সুরে জানাল লা স্যাল। 'এঁরা ওই গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন, গাড়ি গেছে নষ্ট হয়ে। ওই যে, আলগা চাকা নিয়ে কেতরে দাঁড়িয়ে আছে। এঁদেরকে দয়া করে আপনার গাড়িতে করে জেনেভা পর্যন্ত পৌঁছে দিন।'

লা স্যালের তোষামোদিতে কাজ হলো। কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করল না চালক। গাড়িতে তুলে নিল ইনেজ ও লুইকে।

'কাগজ-পত্র সব ঠিকঠাক আছে তো?' এ প্রশ্নটাই শুধু করল কোচোয়ান।

'নিশ্চয়ই!' বললেন ইনেজ।

'আপনি যাবেন না?' লা স্যালকে জিজ্ঞেস করল কোচোয়ান।

'না, সিটিজেন, আমি ওঁদের সঙ্গে নই। অনেক ধন্যবাদ। আমি ঘোড়া নিয়ে চলে যেতে পারব।'

স্টেজকোচ চলে গেলে বিমর্ষ হয়ে পড়ল লা স্যাল। আবার কবে না কবে দেখা হয় লুইয়ের সঙ্গে কে জানে। লুইয়ের চোখে-মুখেও অজানা আশঙ্কার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল।

ওদের বিদায় দিয়ে, ঘোড়ার লাগাম ধরে রাস্তা থেকে নামিয়ে আনল লা স্যাল। রাস্তার একটা পাশ ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া, ঢালু মত। লা স্যাল ঘোড়াসহ চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন ঝোপের ভেতর। এবং ঝোপের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ও। 'তুই একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আসছি।'

লা স্যাল কিন্তু সোজা গিয়ে গাড়িতে চাপল।

'ধীরে-সুস্থে গাড়ি চালাও,' বলল চালককে। 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। শুধু মনে রেখো, আমরা লি গ্রোসেয়ার থেকে আসছি। আমিই একমাত্র যাত্রার শুরু থেকে আছি। আমরা জেনেভা যাব, তবে লেসিয়ার্স হয়ে।'

মিউডন থেকে বাইশ মাইল পুবে লি গ্রোসেয়ার। পাহাড়ী এক রাস্তা গ্রোসেয়ার থেকে বেরিয়ে জেনেভা গেছে। রাস্তাটা মিউডন-জেনেভা রাজপথে এসে মিলেছে অক্সেয়ারের কাছাকাছি এক জায়গায়।

দুলকিচালে চলেছে গাড়ি। জঙ্গলে ছেড়ে আসা ঘোড়াটার কথা ভেবে মনটা খারাপ লাগছে লা স্যালের। জানোয়ারটা অবশ্য প্রাণে মরবে না। কেননা, ও পথে যাতায়াত আছে মানুষজনের। ওটার চিৎকার শুনে কেউ গিয়ে হয়তো মুক্তি দেবে। লা স্যালের পক্ষে যদি সম্ভব হত রাজপথে ছেড়ে রেখে আসত ঘোড়াটাকে। কিন্তু ডেমারেতের কথা ভেবে পারেনি। ওটাকে দেখতে পেলে নানা সন্দেহ জাগত তার মনে।

ঘোড়ার চিন্তা শেষমেশ মাথা থেকে বিদেয় করে দিল লা স্যাল। রাজত্ব নিয়ে যেখানে কথা, সেখানে একটা ঘোড়ার ভাগ্য নিয়ে পড়ে থাকলে কি চলে?

ভোলান্টের সরাইখানা কাছিয়ে এসেছে, এমনি সময় পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

'ওরা এসে পড়েছে,' চালক বলল।

'আসুক। তুমি তোমার মত চালাতে থাকো। ওরা এসে পড়ার আগেই যদি সরাইখানায় পৌঁছতে পারো, তাহলে গাড়ি থামাবে। নিজে খাবে-দাবে, ঘোড়াদেরও দানাপানি দেবে। আর একটা কথা, আমার নাম যে হুজন সে কথা ভুলে যেয়ো না কিন্তু। লি গ্রোসেয়ার থেকে আসছি, লেসিয়ার্স হয়ে জেনেভায় যাচ্ছি। তোমার বাড়িও লি গ্রোসেয়ারে।'

ইতোমধ্যে দৃষ্টিগোচর হলো ভোলান্ট সরাইখানা।

এসে পড়েছে অশ্বারোহী ডেমারেত বাহিনী। ঘিরে ফেলেছে গাড়ি। তার দলে

এখন নিজের লোকেরা ছাড়াও বাড়তি পাঁচজন লোক রয়েছে। পরনে তাদের পুলিসের পোশাক। এদেরকে অক্সেয়ার থেকে নিয়ে এসেছে ডেমারেত। আটঘাট বেঁধেই সে হাজির হয়েছে।

লা স্যালদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'ব্যাপার কি?' গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে গর্জে উঠল লা স্যাল। 'আপনারা পুলিস না ডাকাত? ভাব দেখে মনে হচ্ছে, দেশে এখনও রাজতন্ত্র চলছে, আর আপনারা একেকজন ব্যারন-কাউন্ট!'

মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেল ডেমারেত। অবশ্য তার পরক্ষণেই সামলে নিল।

'বাজে কথা রাখুন। আপনার সঙ্গী দু'জন কোথায়, এক প্রৌঢ় আর এক কিশোর?'

হা-হা করে হেসে উঠল লা স্যাল।

'প্রৌঢ় আর কিশোর? আমি জাদু জানি, সাহেব, ওদেরকে ফুসমন্তর করে বাতাসে মিলিয়ে দিয়েছি।' তারপর ডেমারেতকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই আবার বলল, 'আপনার কথা-বার্তা কিন্তু খুবই আপত্তিকর। আমি একা, আমার সঙ্গে কেউ নেই। লি গ্রোসেয়ার থেকে রওনা হয়ে জেনেভা যাচ্ছি। মাঝে অবশ্য লেসিয়ার্স ঘুরে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি রাস্তার মাঝখানে আমাকে এভাবে আটকাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। দয়া করে পথ ছাড়ুন। পুলিসের কাজ জনসাধারণকে সাহায্য করা, তাদের অসুবিধা করা নয়। বিপ্লব থেকে এ শিক্ষাটুকু অন্তত নেয়া উচিত আপনাদের।'

লা স্যালের হম্বিতম্বি দেখে ডেমারেত বুঝতে পারল না, সে আসলেই নির্দোষ নাকি বেপরোয়া, ডাকাত ধরনের লোক। অগত্যা কাগজপত্র দেখতে চাইল।

'তার আগে আমি প্রমাণ চাই আপনি পুলিসের ছদ্মবেশে ডাকাত নন,' সাফ জানিয়ে দিল লা স্যাল।

ডেমারেত রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও মুখে কিছু বলতে পারল না। এ লোকের প্রমাণ চাইবার অধিকার আছে। কেননা, ডাকাতরা তো প্রায়ই পুলিসের পোশাক পরে হামলা চালায় পথে-ঘাটে।

কোটের বোতাম খুলে পুলিসবাহিনীর চিহ্ন লাল বৃত্ত দেখিয়ে দিল ডেমারেত। লা স্যালও এবার ভালমানুষের মত কাগজপত্র তুলে দিল তার হাতে। দেখা গেল হুজন নামে এক মিষ্টি বিক্রেতার নাম লেখা পাসপোর্টে। আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে সব কাগজপত্র ফেরত দিল ডেমারেত।

'আপনি লেসিয়ার্স যাবেন?' বিরস মুখে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুসরণ করতে পারেন। ভোলান্টে

খাওয়া-দাওয়া সেরে লেসিয়ার্সে এক আত্মীয়র সাথে দেখা করব। তারপর রওনা হব জেনেভা।'

'আচ্ছা, একটা কথা,' মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হলো ডেমারেত। 'লাল-সাদা একটা গাড়ি কি আপনার চোখে পড়েছে? একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে দু'জন লোক সীমান্তের দিকে যাচ্ছে–'

'বেশিরভাগ গাড়িই তো লাল-সাদা,' বলল লা স্যাল। 'আচ্ছা, চলি।'

তার গাড়ি ছেড়ে দিল কোচোয়ান।

ভোলান্টে পুলিস দলটির সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করল লা স্যাল ও কোচোয়ান। ওরা বিচ্ছিন্ন হলো তেমাথায় এসে, লেসিয়ার্সে যাওয়ার রাস্তা যেখান থেকে বেরিয়েছে। লা স্যাল চলল লেসিয়ার্সের উদ্দেশে, আর ডেমারেত এগোল জেনেভার দিকে। ডফিনকে পেলে জোর করে ধরে আনবে, পরে যা হওয়ার হবে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা, লা স্যাল যখন লেসিয়ার্স পৌছল। তবে এসময়টায় বৃষ্টি-বাদল তেমন একটা হয় না। শীঘ্রি হয়তো মেঘ কেটে যাবে, মনে মনে আশা করছে লা স্যাল। ঝড়-বৃষ্টি হলে ইনেজ হয়তো লেক লেম্যান পেরোতে চাইবেন না, লেবাসের বাড়িতে অপেক্ষা করবেন। ডেমারেত জেনেভা যাচ্ছে যখন, লেবাসের বাসায় নিশ্চয়ই একবার ঢুঁ মেরে যাবে। রাজভক্তদের আশ্রয়স্থল যে ওই বাড়িটা তা নিশ্চয়ই জানা আছে ওর।

লা স্যাল সে রাতটা সরাইখানাতেই রয়ে গেল। রাতে এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠল যে পরদিন রাত অবধি আর বিরাম দিল না। ফলে লা স্যাল লেসিয়ার্স ত্যাগ করতে পারল না।

অবশেষে এক বুক দুশ্চিন্তা নিয়ে তৃতীয় দিন সরাই ছাড়ল লা স্যাল। ডেমারেত জেনেভায় গিয়ে কি করছে কে জানে। ইনেজ বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ছল-চাতুরীতে মোটেও দক্ষ নন। বিপদের সময় তাঁর মাথা গুলিয়ে যাবে কিনা, দুর্ভাবনা হচ্ছে লা স্যালের।

লা স্যাল জেনেভা পৌছেই লেবাসের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু ভদ্রলোক বাড়ি নেই! কাজের লোকটিকে জিজ্ঞেস করে কোন হদিস পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন ভৃত্য কিছুই জানে না।

কি আর করা, লেবাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হ্রদের উদ্দেশে পা বাড়াল লা স্যাল। পথে লোকজন সব ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। ঝড়ে অনেক নৌকা নাকি ডুবে গেছে হ্রদের বুকে।

ইনেজ কি ওই দুর্যোগের মধ্যে নৌকায় উঠেছিলেন?

লা স্যাল হ্রদের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনিসময় একখানা জেলে-ডিঙি ভিড়ল। জেলেরা ডিঙি থেকে একটা মৃতদেহ নামাল। মৃতদেহের মুখের চেহারা লক্ষ করতে মাথায় বাজ পড়ল যেন লা স্যালের। সেই মৃতদেহ ব্যারন ইনেজের।

সাত

সতেরোশো পঁচানব্বই সালে ইনেজের নৌকাডুবি হয় লেক লেম্যানে। পরবর্তী বিশ বছর নানা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

ইনেজের লাশ স্বচক্ষে দেখার পর আর ফ্রান্সে ফিরে যায়নি লা স্যাল। ওখানে ওত পেতে ছিল ডেমারেত, গেলেই ক্যাঁক করে ধরত। বারবার তাকে ধোঁকা দেয়া এমনকি লা স্যালের পক্ষেও সম্ভব হত না। লা স্যাল যে হুজন নয়, দ্য বাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সে কথা কি আর জানতে বাকি ছিল ডেমারেতের?

ইনেজকে জেনেভায় দাফন করা হয়। তাঁর শেষকৃত্যে শুধুমাত্র লা স্যালই যোগ দেয়। লাশ শনাক্ত করা, স্মৃতিফলক তৈরি করা এসব ও না করলে করার আর কেউ ছিল না।

তবে নিখোঁজ হ্যাগেনব্যাক ও ব্যারন ইনেজ যে একই লোক একথা প্রমাণ করার চেষ্টায় তৎপর ছিল একটি লোক। ডেমারেত।

মৃত ইনেজ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ডেমারেত। তথ্যগুলো তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ইনেজের সঙ্গে একটি বছর দশেকের ছেলে ছিল। তৃতীয় কোন লোক ছিল না। কিন্তু ডেমারেত যে দলটিকে খুঁজছিল তাতে সদস্য ছিল তিনজন। কোথায় গেল সেই তৃতীয় লোকটি? জেনেভায় কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি।

সেদিনের ঝড়ে অনেক নৌকা ডোবে। মারা পড়ে অনেক মাঝি-মাল্লা-জেলে। মারা পড়েন বিদেশী ভদ্রলোক ইনেজও। ঝড়ের মধ্যে তাঁকে নৌকা নামাতে নিষেধ করে সবাই। কিন্তু ভয়ানক তাড়া ছিল ভদ্রলোকের। ফলে কারও কথায় কান দেননি। আর তার ফলও পেয়েছেন হাতেনাতে।

তাঁর সঙ্গী বালকটির দিকে কেউ তেমন দৃষ্টি দেয়নি। আপাদমস্তক বর্ষাতি দিয়ে ঢাকা ছিল সে, তার মুখ কেউ দেখতে পায়নি। তাকে কোন কথা বলতেও শোনা যায়নি। তবে একটি ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই একমত, ছেলেটি রীতিমত সাহসী– তাকে বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত মনে হয়নি। কিন্তু তাতে লাভটা হলো

কি? বেচারীর মৃতদেহটাও তো খুঁজে পাওয়া গেল না। ঝড়ের পর অনেকে নৌকা নিয়ে হ্রদের দু'মাথায় তল্লাশী চালায়, জীবিত কিংবা মৃত কাউকে যদি পাওয়া যায়। কাউকে কাউকে তারা ফিরিয়েও আনে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ছেলেটি ছিল না।

লা স্যাল ও ডেমারেত দু'জনের কানেই খবরটা পৌঁছয়।

ডেমারেত ফোকের কাছে গিয়ে তার নিজের মতামত জানায়। তার ধারণা, সপ্তদশ লুই ডুবে মরেছে একথা বলার সময় এখনও আসেনি। কেননা, কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি। ওই ইনেজ সাহেবই যদি হ্যাগেনব্যাক হন, তাহলে খুব সম্ভবত তিনি রাজপুত্রকে নিয়ে লেক লেম্যান পেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পানিতে ডুবে মারা গেছেন ঠিকই, কিন্তু রাজপুত্র বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। সেই ঝড়ের মধ্যেও লেকে দু'একটি নৌকা ছিল। তারা নিশ্চয়ই একটি জলমগ্ন বালককে দেখতে পেয়েও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। কাজেই, রাজপুত্র মৃত একথাটি ভেবে নেয়ার কোনই কারণ নেই।

ওদিকে লা স্যাল অত খোঁজ-খবর করতে পারেনি। সে ছিল ডেমারেতের ভয়ে কাবু। ফলে, জেনেভা থেকে সে পালিয়ে যায়। ডেমারেতরা দলেবলে ছিল ভারী। ওকে রাতের অন্ধকারে জোর করে ফ্রান্সে ধরে নিয়ে গেলেও কিছু করার ছিল না।

জেনেভা যদিও বিদেশ, তবুও ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের পুলিস প্রায়ই হামলা চালায় ওখানে।

এছাড়াও সমস্যা ছিল আরও। লেবাস সেই যে বাড়ি ছাড়েন তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। লা স্যাল দু'দিনে কয়েকবার গেছে তাঁর খোঁজে। কিন্তু কাজের লোকটিকে বারবার জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পায়নি।

সপ্তদশ লুইকে যিনি নিরাপদে সুইটজারল্যান্ডে ঢুকিয়ে দেবেন, সেই লেবাস নৌকাডুবির সময় থেকেই নিরুদ্দেশ।

কি এর অর্থ? তিনি কি নৌকায় উঠেছিলেন? কই, তেমন কথাও তো কেউ বলছে না!

শেষমেশ কোন গতি করতে না পেরে জেনেভা ত্যাগ করল লা স্যাল। সুইটজারল্যান্ড পেরিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল সে, সোজা প্রুশিয়ার ব্র্যান্ডেনবুর্গে। লা স্যালের হয়তো মনে মনে আশা ছিল, রাজা ফ্রেডরিকের সঙ্গে দেখা করে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবে। কিন্তু রাজা তখন ব্র্যান্ডেনবুর্গে গরহাজির, বিভিন্ন সীমান্তে তিনি সৈন্যচালনা করছেন।

ওখানে লা স্যালের পরিচয় হলো সমবয়সী যুবক কার্ল থিয়োডর ফন ইনেজের সঙ্গে। সে ব্যারন ইনেজের ভাইপো ও উত্তরাধিকারী। এর কথা সে ফন

ইনেজের মুখে আগেই শুনেছিল। সে গিয়ে সহজেই দেখা করতে পারল যুবকের সঙ্গে।

চাচার মত রাজনীতিতে জড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই যুবকের। ওর সঙ্গে কথা-বার্তায় সেরকম ইঙ্গিত পায়নি লা স্যাল। তবে আন্তরিক সহানুভূতি পেয়েছে।

ব্যারনের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকা এবং গাঁটের পয়সা খরচ করে স্মৃতিফলক বসানোয় লা স্যাল কার্ল থিয়োডরের ঘরের মানুষ হয়ে উঠল। কার্ল প্রাণপণ চেষ্টা করল লা স্যালকে ব্র্যান্ডেনবুর্গে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কার্ল কিছু টাকা ধার দিল, আর লা স্যালের নিজেরও ছিল কিছু। এই দিয়ে ও শহরে ছোটখাট একটা সরাইখানা খুলে বসল লা স্যাল।

কার্ল থিয়োডর ওকে খিতু করে দিয়ে জেনেভা গেল। চাচার সমাধিতে ফুল দেবে, আর সমাধির ওপর পাথরের একখানা স্তম্ভও গড়ে দেবে।

লা স্যাল একা মানুষ, কতটুকুই বা তার চাহিদা। সরাইখানার আয়ে তার বেশ ভালই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই দুষ্ট বুদ্ধি ভর করল মাথায়। আরও বেশি রোজগারের মতলবে গোপনে জুয়ার আড্ডা খুলল সে সরাইখানায়। ফলে, দেদার আয় হতে লাগল। পুলিস মাঝেমধ্যে হানা দেয়। তখন নিজে উদ্ধার না পেলে বন্ধু কার্ল থিয়োডরের সাহায্য নেয়। শাসক মহলে কার্লের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। লা স্যালের অপকর্ম সমর্থন না করলেও, যুবকটি যেহেতু চাচার শেষ সময়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী—সে যথাসাধ্য করে।

এভাবে কেটে গেল বিশ বছর।

এই বিশ বছরের ভেতর লা স্যাল মাঝে-মধ্যে কারাগারে গেছে দু'চার মাসের জন্যে। তাতে অবশ্য তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কেননা, ততদিনে প্রচুর টাকা জমে গেছে ব্যাঙ্কে।

লা স্যাল কিন্তু এত বছরেও বিয়ে করেনি। বিয়ে করার কোন আগ্রহও বোধ করেনি সে। একবার অবশ্য বিয়ের ফাঁস গলায় পরতে পরতে বেঁচে গেছে। ঘটনা কিছু না, বসন্ত হয় লা স্যালের। কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের এক মাঝবয়সী মহিলার অক্লান্ত সেবায় সে যাত্রা রক্ষা পায় সে। মহিলার দুর্ভাগ্য, লা স্যালকে সুস্থ করে তুললেও সে নিজেই আক্রান্ত হয় কালব্যাধিতে। লা স্যালকে আজন্ম কৃতজ্ঞ করে রেখে মারা যায় সে। তা নাহলে হয়তো কৃতজ্ঞতার বশে তাকে বিয়ে করত লা স্যাল।

লা স্যাল ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। ফ্রান্স ছেড়েছে সে বিশ বছর। ইতোমধ্যে ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে উদয় হয়েছেন এক জ্বলন্ত সূর্য—নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। কর্সিকার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, সামান্য সৈনিক থেকে কর্নেল হয়েছেন। কনসল পদবী ধারণ করে ফ্রান্সের শাসনভার

তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। ইউরোপের বহু শতাব্দী প্রাচীন রাজবংশগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু সব কিছুরই যেমন শেষ আছে, তেমনি আঠারোশো পনেরো সালে এই প্রবল প্রতাপশালী রণ-সম্রাটকেও পরাভব মানতে হলো। ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করে, নেপোলিয়নকে নির্বাসিত জীবনযাপনের জন্যে চলে যেতে হলো এলবার ছোট্ট দ্বীপে।

বোবোঁ রাজপন্থীরা এতে উৎসাহিত হলো। নেপোলিয়ন বিতাড়িত করেছিলেন বিপ্লবী সরকারকে। আর নেপোলিয়নকে বিতাড়িত করল ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মিত্র বাহিনী। ফ্রান্সের শাসনদণ্ড আজ কে তুলে নেবেন হাতে?

ফরাসি রাজবংশের উত্তরাধিকার ফ্রান্সে না থাকলেও ইংল্যান্ডে রয়েছেন। পরলোকগত ষোড়শ লুইয়ের কনিষ্ঠ ভাই অষ্টাদশ লুই। সপ্তদশ লুই বলা হয়ে থাকে ষোড়শ লুইয়ের পুত্র লুই চার্লস, অর্থাৎ ডফিনকে। কিন্তু সে তো মারা গেছে। কাজেই অষ্টাদশ লুইকে ঘিরেই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হলো রাজভক্তদের।

ফরাসি বিপ্লবের গোড়ার দিকে দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান অষ্টাদশ লুই। সে থেকে ওখানেই রয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের ভাতা নিয়ে বাস করেন ব্রাইটনে। একটি পুতুল মন্ত্রীসভাও গঠন করেছেন তিনি। প্রাণভয়ে পলাতক ফরাসি অভিজাতদের নিয়ে গড়া তাঁর মন্ত্রীসভা। এঁদের কেউ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কেউ প্রধান সেনাপতি, কেউ বা আবার কোষাধ্যক্ষ। বলা যেতে পারে, দীর্ঘ বিশ বছর ধরে ইনি রাজা-রাজা খেলা খেলে চলেছেন।

নেপোলিয়নের পতনের পর থেকেই আশায় বুক বেঁধে বসে রয়েছেন অষ্টাদশ লুই। এই বুঝি ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বলবে, 'ফ্রান্সে গিয়ে সিংহাসনে বসে পড়ুন। আর কোন ভয় নেই। তাছাড়া আমরা তো আছিই।'

অবশেষে একদিন এল সেই সুসংবাদ। ব্রিটিশ রণতরীতে চেপে ফ্রান্সে ফিরলেন অষ্টাদশ লুই। তাঁকে পাহারা দিয়ে ঘিরে রেখেছে ব্রিটিশ দেহরক্ষীরা। অভিজাত বংশের অল্প কয়েকজন নারী-পুরুষ তাঁকে জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাল। এদের জমিদারি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এখন আশা, যদি আবার কপাল ফেরে। অষ্টাদশ লুই ওদের জমিদারি ফিরিয়ে দেবেন, এই আশায় ভর করে জড় হয়েছে তারা।

লা স্যালের কাছে কিন্তু সব খবরই পৌঁছয়। অষ্টাদশ লুই ইয়া মোটা, সাড়ে চার মণ তাঁর ওজন। তাঁকে কেউ বলে কুমড়োপটাশ, কেউ বলে তেলের পিপে। ভোগ-বিলাস ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁর মন নেই। এসব শোনে আর আফসোস করে লা স্যাল। ওই লোক লেম্যান ফরাসি দেশের কতবড় সর্বনাশটাই না করেছে! ডফিন আজ বেঁচে থাকলে এই কুমড়োপটাশটা কখনও সিংহাসনে বসে? এই

তেলের পিপেটার চাইতে একশো গুণ ভাল শাসক হতে পারত ওই পুঁচকে ডফিন। 'ধরা পড়া নিশ্চিত বুঝলে আপনি কিন্তু আমার বুকে ছুরি বসাবেন–' সপ্তদশ লুইয়ের আদেশটির কথা আজকাল বড্ড মনে পড়ে লা স্যালের। অতটুকু ছেলে, জান দেবে তবু ধরা দেবে না–এতটাই স্পৃহা কাজ করছিল তার ভেতর।

লা স্যাল ব্র্যান্ডেনবুর্গে আছে আজ বিশ বছর। ফ্রান্সে ফেরার ইচ্ছে হলেও কখনও ব্যাকুল হয়ে পড়েনি। আজ কেন কে জানে, জন্মভূমির মুখদর্শনের জন্যে তীব্র এক আকুতি পেয়ে বসল ওকে। নেপোলিয়নের যুগ তো দেখেনি ও, মনে গেঁথে রয়েছে রোবেস্‌পিয়ের যুগের ফ্রান্সের ছবি। রাজতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার পর দেশের কী অবস্থা দেখার জন্যে প্রবল আগ্রহ অনুভব করছে ও।

শেষ অবধি দেশে যাবে স্থির করল সে। বিশটা বছর কম সময় নয়। কেউ এখন আর চিনবে না তাকে। তবে দ্য বাজ বেঁচে থাকলে অবশ্যই চিনবেন। তিনি জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই উচ্চাসনে রয়েছেন বর্তমান আমলে। তিনি নিশ্চয়ই লা স্যালকে অবজ্ঞা-অবহেলা করবেন না। দ্য বাজের দেখা পেলে লা স্যাল নিজেও শান্তি পাবে। ভদ্রলোকের কথায়, বিশ বছর আগে সে কি জীবনের ওপর কম বড় ঝুঁকি নিয়েছিল?

আস্থাভাজন এক কর্মচারীর ওপর সরাইখানা চালানোর ভার দিয়ে দেশের পথে পা বাড়াল লা স্যাল। জুয়ার আড্ডা অবশ্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হলো। কেননা, আড্ডা চালাতে হলে অভিজ্ঞ লোক দরকার। চাই বললেই অমন লোক পাওয়া যায় না।

ফ্রান্সে পৌঁছতে বেগ পেতে হলো না। ফ্রান্সের দরজা সবার জন্যে এখন অবারিত। দেশে সরকার রয়েছে না থাকারই মত। ফলে, পাসপোর্ট নিয়ে মাথা ঘামানোরও কেউ নেই।

প্যারিসে পৌঁছে কিছুই আর চিনতে পারে না লা স্যাল। গোটা শহরটার চেহারা আমূল পাল্টে গেছে। নতুন নতুন প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সুদৃশ্য ফোয়ারা, বাগান, বিজয়তোরণ। সবই ওই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অবদান।

দ্য বাজের বাসস্থান খুঁজে পায় কিভাবে লা স্যাল? অবশেষে যদিও বা পেল, কিন্তু সমস্যা হলো দ্য বাজ ওখানে থাকেন না। এখন যারা থাকে, তাঁরা দ্য বাজের নামও শোনেনি।

ভদ্রলোক তাহলে গেলেন কোথায়?

হঠাৎই বুদ্ধিটা খেলে গেল ওর মাথায়। রাজপ্রাসাদে গিয়ে খোঁজ করলেই তো হয়। বোরবোঁদের আমলে তাঁকে নিশ্চয়ই বুকে টেনে নেয়া হয়েছে। হাজার হলেও নৃশংস গিলোটিন যুগের দুঃসাহসী রাজভক্ত তিনি।

অবশেষে টুইলারি প্রাসাদে এসে হাজির হলো লা স্যাল।

'মঁসিয়ে দ্য বাজ কোথায় বলতে পারেন? ব্যারন আর্মানথ্যু?'

জবাব যা পেল, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বুঝি এতখানি আশ্চর্য হত না লা স্যাল। প্রহরী, সৈনিক, বড়-বড় কর্মকর্তা কেউই বলতে পারল না দ্য বাজ কোথায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, এরা কেউ দ্য বাজের নাম পর্যন্ত শোনেনি।

কি আর করা, ডিউক ব্র্যাকাসের সঙ্গে দেখা করতে চাইল লা স্যাল। ইনি এত বছর বাস করেছেন ইংল্যান্ডের ব্রাইটনে। নিজের পরিচয় দিতেন পিতৃদত্ত 'দ্য কোপালা' নামে। মোসাহেবীতে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আর তার প্রতিদানও তিনি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছেন। অষ্টাদশ লুইয়ের ওপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব। একাধারে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছেন তিনি। অষ্টাদশ লুই তাঁর মোসাহেবীতে তুষ্ট হয়ে শুধু যে মন্ত্রীত্ব দান করেছেন তাই-ই নয়, ডিউক উপাধি ও পাঁচ-সাতটা জমিদারিও দান করেছেন।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছিলেন, প্রশাসনে ব্র্যাকাসের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তাঁদের দাবড়ে দিয়েছেন স্বয়ং অষ্টাদশ লুই। তাঁর বিশ্বাস, নেপোলিয়নের ডান হাত ছিলেন যে টালিরান্ড, যিনি এখন তাঁর চাকরি করছেন–ডিউক ব্র্যাকাস তাঁর চাইতে হাজার গুণ যোগ্য। লোকে শোনে আর মনে মনে হাসে। জায়গামত তেল দিতে পারলে দুনিয়ায় অসাধ্য সাধন সম্ভব।

যাক সে কথা। লা স্যাল তো ব্র্যাকাসের সাক্ষাৎ চাইল। কিন্তু চাইলেই কি আর তাঁর মত লোকের দেখা পাওয়া যায়? ব্র্যাকাসের অনেকগুলো সচিবের একজন দর্শন দিলেন লা স্যালকে। ভদ্রলোক জাতিতে ইতালীয়, পেশায় ক্যাথলিক ধর্মযাজক। ব্রাইটনে কোপালার সঙ্গে যাজক হিসেবে যোগাযোগ ছিল তাঁর, এখন তার সুফল পাচ্ছেন।

'মহামান্য ডিউকের কাছে কি দরকার?'

'ব্যারন দ্য বাজের খবর জিজ্ঞেস করতাম।'

'ব্যারন দ্য বাজ! তিনি আবার কে?' যাজক ভদ্রলোক রীতিমত তাজ্জব বনে গেলেন।

অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করল লা স্যাল। আরেকটু হলেই খেঁকিয়ে উঠেছিল প্রায়।

'দ্য বাজ ছিলেন গিলোটিন যুগের সেরা রাজভক্ত,' বলল লা স্যাল 'গিলোটিন যুগ কি জানেন তো, নাকি তাও জানেন না?'

গিলোটিনের নাম শুনেছেন সচিব ভদ্রলোক। তিনি কোন জবাব না দিয়ে একটা মোটা খাতা টেনে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলেন।

'ব্যারন আর্মানথ্যুর নামে কোন নথি থেকে থাকলে এখানে পাওয়া যাবে।'

হায়রে কপাল! নথি দেখে যাদের ব্যারন আর্মানথ্যুকে চিনতে হয় তারাই কিনা আজ ফ্রান্সের ক্ষমতায়! কিন্তু এদের ওপর রাগ করেই বা কি হবে।

ইতোমধ্যে বিশেষ একটি পাতায় দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছে সচিবের।

'এই তো, পাওয়া গেছে। ব্যারন দ্য আর্মানথ্যু। ১৭ নং রু্য সেন্ট গ্যাব্রিয়েল। তাঁর সম্পর্কে সব কথাই লেখা রয়েছে এখানে। আর তার পাশে ডিউকের নির্দেশও লিখে রাখা আছে। আর্মানথ্যু রাজার আমলে কর্নেল ছিলেন। প্রথম সুযোগেই তাঁকে তাঁর হারানো পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

'প্রথম সুযোগ আসতে যদি দু'বছর লেগে যায়?' তেতো কণ্ঠে বলল লা স্যাল।

'দু'বছর তো কমই, বেশিও লেগে যেতে পারে,' বললেন সচিব। 'যুদ্ধ-টুদ্ধ তো নেই। কাজেই সেনাবাহিনীতেও আপাতত নতুন লোক নেয়া হবে না।'

'দ্য বাজ ততদিন বাঁচলে হয়। তাঁর বয়স এখনই প্রায় সত্তর বছর।'

'সে তো আর ডিউক ব্ল্যাকাসের হাতে নয়। তিনি অনেক বিদ্যাই জানেন বটে, কিন্তু বুড়োদের অমর করে রাখার বিদ্যা বোধ করি জানেন না।'

লা স্যাল ধৈর্য হারিয়ে উঠে দাঁড়াল। সচিবের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হিসহিস করে বলল, 'আপনি যদি যাজক না হতেন, আপনাকে আমি দেখে নিতাম।'

যাজক লা স্যালের ভয়ে পেছনদিকে হেলে পড়েছেন। সে অবস্থাতেই ঘণ্টি বাজালেন। বেয়ারা এলে তাকে হুকুম করলেন আগন্তুককে কামরা থেকে বের করে দিতে।

লা স্যাল নিজেই ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। এখানে এসে একেবারে যে লাভ হয়নি তা নয়। দ্য বাজের ঠিকানাটা একবার উচ্চারণ করেছিলেন যাজক সাহেব, মনে আছে তার।

দু'দিন লাগল ওর রু্য সেন্ট গ্যাব্রিয়েল নামে পাড়াটা খুঁজে বের করতে। একটা বস্তী ওটা। ভাঙাচোরা বাড়িঘর, সরু, নোংরা গলি-ঘুঁজি, আবর্জনা উপচে পড়ছে চারদিকে, নর্দমার পচা পানির উৎকট দুর্গন্ধ। হায় খোদা, প্যারিস শহরেও এমন এলাকা আছে?

লা স্যাল দোতলায় উঠে এল ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে। এক রংচটা দরজায় টোকা দিতেই সাড়া দিলেন স্বয়ং দ্য বাজ।

বড্ড বুড়িয়ে গেছেন ভদ্রলোক। বিশ বছর আগে চোখে যে দীপ্তি ছিল, চাল-চলনে ছিল দৃপ্ত ভঙ্গি, চোয়ালে দেখা যেত কঠোর দৃঢ়তা—তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি তাঁর, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া শার্ট।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'ফ্লোরেন্স, ফ্লোরেন্স দ্য স্যাল।' এটুকু বলেই দ্য বাজকে আলিঙ্গন করল লা স্যাল।

দ্য বাজের এক কামরার বাসা। দু'দিকে দুটো খাটিয়া পাতা। একটায় দ্য বাজ থাকেন, অন্যটায় ভার্নিল।

'ভার্নিলকে মনে পড়ে?' প্রশ্ন করলেন দ্য বাজ।

লা স্যালকে ইতস্তত করতে দেখে বুঝিয়ে দিলেন, 'ওই যে, রানীকে কনসার্জারির কারাগার থেকে যে লোক উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল? রানী ছেলেমেয়েদের না নিয়ে একা পালাবেন না বলে চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়।'

এবার মনে পড়ল লা স্যালের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পুলিস ভার্নিলের পিছু নেয়। অল্পের জন্যে বেঁচে যায় সে, নইলে গিলোটিন অবধারিত ছিল।'

'হ্যাঁ, সেই ভার্নিল আর আমি থাকি এখানে। কয় সপ্তার ভাড়া যে বাকি আল্লা মালুম।'

'কিন্তু এ কি হাল ঘরের! কাজের লোক নেই? ঘরে আসবাবপত্রও তো কিছু দেখছি না।' লা স্যালের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ।

'জিনিসপত্র সব বেচে খেয়েছি। ঘর-বাড়ি, জমিদারি তো আগেই গেছে, রাজতন্ত্রের সেবা করতে গিয়ে। গায়ের কোটটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছি। থাকার মধ্যে আছে শুধু ওই তরোয়ালটা।' দেয়ালে ঝুলছে তরোয়ালটা, আঙুল-ইশারায় দেখালেন তিনি। 'ওটার হাতলটা রুপার। বেচলে দু'পয়সা আসত। কিন্তু রেখে দিয়েছি, যদি কোন কাজে আসে।'

লা স্যাল সব শুনে মিনিটখানেক গুম হয়ে থাকল। তারপর গলায় ফুর্তির সুর ফুটিয়ে তুলে বলল, 'এখন ঝটপট দাড়িটা কামিয়ে নিন তো। এত বছর পর দেখা, চলুন কোন হোটেলে গিয়ে দু'জন ভাল-মন্দ কিছু খাই।'

মাথা নাড়লেন দ্য বাজ।

'দাড়ি না হয় কামালাম, কিন্তু বেরোব কি করে?'

'মানে?' লা স্যাল হতবাক।

'আজ যে ভার্নিলের পালা।'

লা স্যালকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝিয়ে বললেন দ্য বাজ। 'ভার্নিলেরও একই দশা, সব বেচে খেয়েছে। দু'জনের সম্বল এখন ওই একটাই কোট আর টুপি। পালা করে ওই দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই দু'জনে। একদিন ও বেরোয়, একদিন আমি।'

লা স্যাল ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে।

'আপনি দাড়িটা কামাতে থাকুন, আমি ততক্ষণে কোট আর টুপি কিনে আনছি।'

লা স্যাল হোটেলে বসে দ্য বাজের মুখ থেকে তাঁর নিজের ও ফ্রান্সের গত বিশ বছরের ইতিহাস শুনল। ভদ্রলোকের আফসোসের অন্ত নেই। বারবার একই কথা বললেন: 'দেশটার কপালটাই খারাপ। তা নাহলে সপ্তদশ লুই ওভাবে মারা যাবে কেন? ছেলেটা বেঁচে থাকলে, যতই অপদার্থ হোক, এই তেলের পিপেটার চাইতে হাজার গুণ ভাল দেশ শাসন করত।'

'এই কুমড়োপটাশটা বেশিদিন টিকতে পারবে না দেখে নেবেন।' বলেছে লা স্যাল।

'আমিও বেশিদিন টিকব না,' হতাশ কণ্ঠে বললেন দ্য বাজ। 'জীবনে দারিদ্র্য কাকে বলে জানতাম না। অথচ গত দশ বছর ধরে কী দারিদ্র্যের মধ্যেই না জীবন কাটাচ্ছি! তারপরও অভাব আর মনোকষ্ট আমাকে কাবু করতে পারেনি। কিন্তু এই কুমড়োপটাশটার অকৃতজ্ঞতা আমাকে হতাশ করে ছেড়েছে। আমার আর বেঁচে থাকার সাধ নেই, সত্যি বলছি।'

'কুমড়োটাকে সরাতে হবে,' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শোনাল লা স্যালের গলার সুর। 'অনেক কেরামতিই তো দেখিয়েছেন আপনি। শেষবারের মত আরও একবার দেখান। টাকার চিন্তা করবেন না, প্রচুর টাকা সঙ্গে এনেছি আমি। আপনি একটা সময় অনেক উপকার করেছেন আমার। এখন কিছুটা ঋণ শোধ করতে চাই। আপনি, আমি আর ভার্নিল একসাথে থাকব। আমি আজই বাড়ি ঠিক করছি। কাল সকালে ওখানে উঠছি আমরা।'

দ্য বাজ নীরবে শুনে গেলেন, কেবল বিদায়লগ্নে উষ্ণ চাপ দিলেন লা স্যালের হাতে।

পরদিন লা স্যাল চলে এল দ্য বাজের বাসায়। বাড়ি ঠিক করে তাঁদের নিতে এসেছে।

কিন্তু কাকে নিয়ে যাবে সে? ঘরে ঢুকে দেখে দ্য বাজ ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন।

দ্য বাজ তরোয়ালটা বিক্রি করেননি, যদি কাজে আসে, এই ভেবে। কাজে এসেওছে। ওটা বুকে গেঁথে আত্মহত্যা করেছেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মানুষকে চিরটাকাল দিয়ে এসেছেন তিনি। শেষ জীবনে এসে অন্যের কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করতে মন সরেনি তাঁর।

আট

দ্য বাজের মৃত্যুর পর লা স্যাল ফিরে এল ব্র্যান্ডেনবুর্গে। দুর্ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর প্যারিসের আবহাওয়া বিষবৎ মনে হচ্ছিল ওর কাছে।

প্যারিস ত্যাগ করলেও ফিরে আসার দৃঢ়সঙ্কল্প কিন্তু ত্যাগ করেনি লা স্যাল। দ্য বাজের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করেছে ও তেলের পিপে ওরফে অষ্টাদশ লুইকে। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে ও।

আহা, সপ্তদশ লুইকে যদি কোনভাবে বাঁচিয়ে তুলতে পারত! কিংবা হঠাৎই যদি জানা যেত, সেদিনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ লেক লেম্যানে ডুবে মরেনি লুই চার্লস, বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে সে—আত্মগোপন করে আছে সুইটজারল্যান্ড কিংবা প্রুশিয়ার কোন নির্জন উপত্যকায়।

লা স্যালের আত্মবিশ্বাসে কোন ঘাটতি নেই: সপ্তদশ লুইকে খুঁজে পাওয়া গেলে সে তাকে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে বসাবেই বসাবে। প্রায় রাতেই ঘুম হয় না তার, ভেবে ভেবে নিরেট এক পরিকল্পনা খাড়া করেছে সে। করে কোন লাভ আছে কিনা নিজেও জানে না, তবুও করেছে।

ওর এতসব পরিকল্পনার মূলে রয়েছে একটাই কারণ। সেটি হচ্ছে, সপ্তদশ লুই যে মারা গেছে হলফ করে একথাটি কেউই বলতে পারেনি, কোন প্রমাণও মেলেনি। সবাই ধরে নিয়েছে, ব্যারন ইনেজের মত একজন প্রাপ্তবয়স্ক, সবল পুরুষমানুষ যখন মারা গেছেন তখন খুদে বালক ডফিন বেঁচে থাকে কি করে?

লা স্যাল কিন্তু ডফিন বেঁচে নেই একথাটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না। ওর অন্তরে আশার আলো নিয়ত মিটমিট করে জ্বলে। আর তা থেকেই এই পরিকল্পনা গড়ে তোলা।

কি সেই পরিকল্পনা?

আবার সেই আসল-নকল। আসল লুই চার্লসকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন নকল একজনকে হাজির করতে অসুবিধা কোথায়? প্রুশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফন স্টিন অমন চিন্তাই করেছিলেন বলে শুনেছে লা স্যাল। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি নেপোলিয়ন ক্ষমতায় ছিলেন বলে। নেপোলিয়নের বিপক্ষে, রাজবংশের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবার মত লোক তখন ফ্রান্সে কে ছিল?

কিন্তু নেপোলিয়ন এখন ক্ষমতায় নেই। ফলে, পাশা উল্টে গেছে। এখন যিনি আছেন তিনি উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্যক্তিত্বহীন এক লোক—অষ্টাদশ লুই। তাঁকে

সরিয়ে সপ্তদশ লুইকে সিংহাসনে বসাতে ফ্রান্সের জনগণের আপত্তি থাকার তো কথা নয়।

কাজেই, লা স্যাল তার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে ক্ষতি কি?

সমস্যা একটাই। সপ্তদশ লুই বানাবার মত লোক নেই ওর হাতে।

টেম্পল কারাগারে ডফিন যেদিন মায়ের বিরুদ্ধে জবানবন্দী দেয়, সেদিন লা স্যালও হাজির ছিল ওখানে। একটার পর একটা ছবি আঁকে সে রাজপুত্রের। তার মধ্যে একটি ছবি অকুণ্ঠ প্রশংসা পায় শামেত ও অন্যান্য সদস্যদের কাছে। সে ছবিটি এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছে লা স্যাল। মাঝে মাঝেই বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

ছবির বালকটির বয়স এখন বেঁচে থাকলে ত্রিশের কাছাকাছি হত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসত মুখের চেহারায়। পরিবর্তনটা কিরকম হত ছবি দেখে কল্পনা করার চেষ্টা করে লা স্যাল।

কল্পনার চোখে ও একটি মূর্তি দেখতে পায়। ছবির বালকের সঙ্গে তার যেমন কিছু মিল রয়েছে তেমনি রয়েছে কিছু অমিলও। কাঁধ অবধি লম্বা, লাল রঙের চুল রয়েছে এ মূর্তিটির। কান দুটো যেহেতু ছোট-বড়, লম্বা চুল না রেখে কান ঢাকার উপায় ছিল না। এবার আসা যাক নাকের প্রসঙ্গে। নাক বোঁচা ছিল ডফিনের। বয়স বাড়লে কারও কারও অবশ্য নাক সামান্য খাড়া হয়। নকল ডফিনের নাক যদি হুবহু নাও মেলে, প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের জবাবে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব।

লা স্যালের হাতে সময়ের বড় অভাব। জুয়ার আড্ডা সারা রাত রমরম করে চলে। দিনভর হোটেলে খদ্দের আসে খানাপিনা করতে। খদ্দেরদের মুখের চেহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করার অভ্যেস তৈরি করেছে লা স্যাল। যদি কাউকে মনে ধরে যায়, তাকে যদি নকল রাজা সাজাতে পারে!

কিন্তু বিধিবাম, তেমন লোকের দেখা আজ পর্যন্ত পায়নি সে।

এরমধ্যে ঘটল আরেক ঘটনা। রোজকার মত জুয়া খেলছিলেন এক ভদ্রলোক, হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি! জাল টাকা চালাচ্ছেন নাকি?'

সবাই সচকিত। লা স্যাল খেলা থামাতে অনুরোধ করল।

যাকে দোষারোপ করা হয়েছে সে এ আড্ডার নিয়মিত অতিথি, যুদ্ধাহত সৈনিক ননডর্ফ। তিন-চার মাস আগে ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে।

জাল মুদ্রাগুলো সবার হাতে হাতে ঘুরছে। ওর দেহ তল্লাশী করে আরও একগাদা জাল মুদ্রা বের করা হলো।

লা স্যাল দোষটাকে খুব বড় করে না দেখলেও, তার অতিথিরা অনেকেই অভিজাত বংশের লোক, তাঁরা ছেড়ে দেবেন কেন? আর তাঁদেরকে অখুশি করার

সাধ্য নেই লা স্যালের। করলে তার ব্যবসা লাটে উঠবে।

কাজেই পুলিসে সোপর্দ করা হলো ননডর্ফকে।

বিচারের দিন ধার্য করা হলে লা স্যালকে সাক্ষ্য দিতে যেতে হলো। সাক্ষী অবশ্য আরও অনেকে হাজির হয়েছে সেখানে। সে রাতে জুয়ার আড্ডায় কতজনই তো ছিল।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, প্রুশিয়ার আইনে জুয়া খেলা দণ্ডনীয় নয়, কিন্তু দণ্ডনীয় হলো জুয়ার আসর বসানো। কাজেই লা স্যাল যে একেবারে নির্ভাবনায় রয়েছে একথা বলা যাচ্ছে না। তবে পুলিসের তরফ থেকে তাকে খানিকটা আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। হাজার হলেও, ননডর্ফকে রক্ষা না করে ধরিয়ে দিয়েছে সে।

যথাসময়ে আদালত বসল। বিচারক সাবধান করে দিলেন লা স্যালকে।

'আপনি বিদেশী মানুষ, তাই এবারের মত ক্ষমা করে দিচ্ছি। কিন্তু আর কখনও জুয়ার আড্ডা বসাতে পারবেন না আপনার হোটেলে, বোঝা গেছে?'

না বুঝে উপায় আছে? ওদিকে, জাল মুদ্রা চালাতে চেষ্টা করায় ননডর্ফকে কঠিন সাজা দিলেন বিচারক। দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে সশস্ত্র পাহারা দিয়ে।

লা স্যাল তখনও আদালতে, জুয়াড়ী ভদ্রলোকরা ওকে সাহস জোগালেন, ও যাতে আড্ডাটা বন্ধ করে না দেয়। বন্ধ করে দিলে ওঁদের সময় কাটবে কিভাবে?

এধরনের কথা-বার্তা চলছে, এমনিসময় লা স্যাল উস্কখুস্ক চুলের এক যুবককে লক্ষ করল। যুবকটি সান্ত্রীদের সামনে ঘোরাঘুরি করছে আর সবাইকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে: 'ননডর্ফকে নিয়ে গেল? কারাগারে নিয়ে গেল?' প্রশ্নের সাথে সাথে সমানে হা-হুতাশ। 'ইস্, আর দশটা মিনিট আগে কেন এলাম না? আমার কপালটা চিরকালই খারাপ। দশ মিনিটের কম-বেশির জন্যে পানিতে পড়ে গেলাম।'

সান্ত্রীদের কাছে কাকুতি মিনতি করতে লাগল সে, ননডর্ফের সঙ্গে একবার দেখা করতে দেয়ার জন্যে।

'আপনারা চাইলেই পারেন। দিন না, ভাই, একটা সুযোগ।'

'আপনি যত সোজা ভাবছেন ব্যাপারটা তত সোজা না,' জানাল এক প্রহরী। 'দেখা করতে চাইলে আপনাকে এখন মার্স টাওয়ারে যেতে হবে। গভর্নর আপনাকে জেরা করবেন। যদি মনে করেন দেখা করতে দেয়া যায় তাহলে দেবেন। বন্দীদের ব্যাপারে তিনিই সব।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল লা স্যাল। এত কিসের দরকার যুবকের ননডর্ফের সঙ্গে দেখা করার?

যুবক তখন মার্স টাওয়ারের অবস্থান জেনে নিচ্ছে, কিভাবে গভর্নরের সঙ্গে

দেখা করা যায় সে ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ওদিকে, একে একে বিদায় নিলেন লা স্যালের পরিচিত জুয়াড়ীরা।

সরাসরি এবার যুবকের সঙ্গে গিয়ে কথা বলল লা স্যাল।

'আপনি এ শহরে নতুন মনে হচ্ছে। আপনাকে কি আমি কোন সাহায্য করতে পারি? পারলে খুশি হব।'

'খুশি হবেন? কেন?' যুবকের দৃষ্টিতে সন্দেহ।

লা স্যালের দৃষ্টি তখন যুবকের কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো লাল চুলের ওপর নিবদ্ধ। কথার ফাঁকে যুবক টুপি খুলতে চুলের গোছা ঝপ করে নেমে এসেছে।

ধুপ-ধাপ লাফাচ্ছে লা স্যালের হৃৎপিণ্ড। এই ছেলের বয়স ত্রিশের আশপাশে। দু'এক বছর কম কিংবা বেশি হতে পারে। সে আরও বেশি উৎসাহী হয়ে উঠল।

'খুশি হব, কারণ আপনার মত আমিও এখানে বিদেশী। যদিও বিশ বছর ধরে আছি। আমি ফ্রান্সের লোক। আপনি?'

'ফ্রান্সের—না, আমি সুইটজারল্যান্ডের।'

ছেলেটির গলার সুরে সংশয় ফুটে উঠল কেন? লা স্যালের মনে সন্দেহ জাগল। তবে মুখে প্রকাশ করল না।

'সুইটজারল্যান্ড তো আমাদের প্রতিবেশী দেশ। চলুন, মার্স টাওয়ারের পথ জানতে চাইছিলেন না? আসুন আমার সঙ্গে।'

ক্রমেই সন্দেহ বেড়ে চলেছে যুবকের, কিন্তু লা স্যালের সাহায্য না নিয়েও পারল না। ধন্যবাদ জানিয়ে লা স্যালকে অনুসরণ করল ও।

মার্স টাওয়ার শহরের বেশ কিছুটা দূরে। ছোটখাট, শক্তপোক্ত একটা দুর্গ। শুধু যে সাধারণ কয়েদীরা থাকে এখানে তা নয়, অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক বন্দীও থাকেন। আর সেজন্যেই এখানে এত কড়াকড়ি।

অনেকটা দূর শুনেও যুবক ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করতে বলেনি। এ থেকে বোঝা যায় তার পকেট ঠাণ্ডা। আর লা স্যালও গাড়ি ভাড়া করতে চাইল না। কে জানে, ও ভাড়া মেটালে যুবক যদি অপমানিত বোধ করে। অগত্যা পায়দলে চলল ওরা।

কথোপকথন থেকে লা স্যাল যুবকটি সম্পর্কে যা জানতে পারল তা সংক্ষেপে এরকম: যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্যে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ও দু'বছর আগে। এতিম হওয়া সত্ত্বেও জীবিকার জন্যে কোন চিন্তা নেই তার। কেননা মামা তাকে সানন্দে ভরণ-পোষণ করে যাচ্ছেন।

মাস ছয়েক আগে যুদ্ধে গুরুতর জখম হয় সে। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে আসা হয় তাকে। এক সময় হাল ছেড়ে দেয়

ডাক্তাররা, ধরে নেয় ওকে আর বাঁচানো যাবে না। এরকম অবস্থায় ওর পাশের বিছানার রোগীটিকে, যে ইতোমধ্যে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, কয়েকটি জিনিস দেয় সে। সেই সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীটিই নর্নডর্ফ।

নর্নডর্ফ এর ক'দিন পরেই হাসপাতাল ত্যাগ করে। যাওয়ার আগে ওকে দিয়ে যায় ব্র্যান্ডেনবুর্গের একটা ঠিকানা। ওখানে গিয়ে জিনিস ফেরত নিয়ে আসতে বলে। অবশ্য নর্নডর্ফ কিংবা যুবক নিজেও আশা করেনি কোনদিন সুস্থ হয়ে উঠবে সে।

এরপর দীর্ঘ ছ'মাস লড়াই করে মৃত্যুকে হার মানিয়েছে যুবক। গত সপ্তায় ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। ছাড়া পেয়েই ব্র্যান্ডেনবুর্গে ছুটে এসেছে আমানত বুঝে নেয়ার জন্যে।

'জিনিসগুলো কি খুব দামি নাকি?' হালকা চালে প্রশ্ন করল লা স্যাল। তারপর নিজে থেকেই যোগ করল, 'ও যেমন লোক, দামি জিনিস পেয়ে হাতছাড়া করবে বলে তো মনে হয় না।'

মাথা নাড়ল যুবক।

'দামি আমার কাছে। অন্যের কাছে কয়েকটা কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। ও কি করবে আমার দলিলপত্র নিয়ে?'

'যুদ্ধে যাওয়ার আগে মামার কাছে রেখে এলেই পারতেন,' বলল লা স্যাল। 'দলিলপত্রের ব্যাপার যখন।'

'অন্যের হাতে ওসব কাগজপত্র দিতে চাইনি। মামার মত পরোপকারী আত্মীয়ের কাছেও না। শুধু মৃত্যু নিশ্চিত টের পেয়ে নর্নডর্ফের হাতে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে দেয়াটা ঠিক হয়নি। মরলে কাগজগুলোও আমার সাথে কবরে যেত। তাতে কারও কোন ক্ষতি হত না।'

প্রচণ্ড কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও লা স্যাল মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারল না ওগুলো কিসের দলিল। হাজার হলেও অন্যের গোপনীয় ব্যাপার।

ইতোমধ্যে মার্স টাওয়ারে পৌঁছে গেছে ওরা। জানা গেল, গভর্নরের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। জেলার এসে কথা বলল।

'নর্নডর্ফের কাছে কি দরকার?'

যুবক জানাল তার কিছু দলিলপত্র জমা আছে নর্নডর্ফের কাছে।

'কিসের দলিল সব খুলে বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। গভর্নরের কাছে পেশ করা হবে বিবরণ। তারপর দেখা করা না করা তাঁর মর্জি।'

'সব কথা খুলে বলা যাচ্ছে না। কাগজগুলো একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। কারও গোপন কথা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে না আইন?'

'আগে না চাইলেও, এখন চাইছে। যা দিনকাল পড়েছে। তাছাড়া আপনি

বিদেশী মানুষ।' লা স্যালের কাছে মনে হলো বিদেশী শব্দটা উচ্চারণ করে যেন 'গুপ্তচর' বোঝাতে চাইল জেলার।

যুবক কিন্তু নাছোড়।

'আমার কাগজ আমাকে দেবেন না কেন? খোদার কসম বলছি, ও দলিল আমি ছাড়া আর কারও কোন কাজে আসবে না। কিন্তু আমার কাছে কাগজগুলোর মূল্য অপরিসীম।'

জেলার অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে লা স্যালের উদ্দেশে চাইল।

'আপনি বয়স্ক মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাকে অক্ষরে অক্ষরে আইন মেনে চলতে হয়? আমি তো বললাম, বিশদ লিখিত বিবরণ ছাড়া গভর্নরের কাছে আমি যেতেই পারব না। সাক্ষাৎ দানের অনুরোধ করা তো দূরের কথা।'

এরপর আর কোন কথা চলে? অগত্যা যুবককে নিয়ে লা স্যাল ধীর পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

'এখন কি করবেন?' প্রশ্ন করল যুবককে।

'কাছেপিঠে নদী থাকলে ডুবে মরব।'

'ডুবতে চাইলেই কি সব সময় ডোবা যায়?'

'কেন, যাবে না কেন? আমি আর জীবনের বোঝা টানতে পারছি না, মরে গিয়ে জ্বালা জুড়োতে চাই। কেউ বাধা দিতে আসবে কেন?'

'আসবে কারণ, কাউকে হাবুডুবু খেতে দেখলে প্রবল ঝড়ের রাতেও উদ্ধার করার লোক জুটে যায় কিনা, তাই।'

আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া। ঢিল যথাস্থানে লাগবে আশা করেনি লা স্যাল। লাগল কিনা তাও বুঝে উঠতে পারল না। যুবক হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওর দিকে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করল লা স্যালের একথাটি বলার পেছনে কোন গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা।

শীঘ্রি অবশ্য সামলে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল যুবক।

'আজই এ শহরে এসেছি। আর এসেই চলে গেছি ননডর্ফের ঠিকানায়। সেখান থেকে আদালতে। থাকার জায়গার ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারিনি। কম পয়সায় দু'একদিন থাকা যায় এমন জায়গা কি আপনার জানা আছে?'

এই-ই তো চাইছিল লা স্যাল।

'আমার নিজেরই হোটেল আছে,' সোৎসাহে বলল। 'ভাড়া নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। চলুন আমার সঙ্গে।' এবার নিজের নাম বলল লা স্যাল।

'আমার নাম চার্লস ডেসলিস পেরিন,' জবাবে বলতেই হলো যুবককে।

পেরিনকে হোটেলে এনে অফিস ঘরে বসাল লা স্যাল।

'একটু বসুন, আমি আপনার ঘরের ব্যবস্থা করছি।' মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে ওকে ঘর দেখাতে নিয়ে গেল লা স্যাল।

'দেখুন তো চলবে কিনা,' বলল ও।

'মাথার ওপরে ছাদ থাকলেই হলো, আর কিছুর দরকার হবে না,' ঘর দেখে গম্ভীর মুখে বলল পেরিন।

ঘরটিতে ছাদ তো রয়েছেই, কিছু আসবাবপত্র এমনকি একখানা ছোট আয়নাও রয়েছে।

'আমি এতটা আশা করিনি,' বলল পেরিন। 'তা ভাড়া কত পড়বে?'

'সেজন্যে চিন্তা করতে হবে না, আপনি যা দিতে পারবেন। যাই, আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে।' লা স্যাল বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

পেরিন একা হলে পর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণে আয়নার পাশে দেয়ালে সাঁটানো একখানা ছবি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

যন্ত্রচালিতের মত তার দৃষ্টি খেলে যাচ্ছে আয়না ও ছবির ওপর। আশ্চর্য মিল! একটি মুখ বালকের, অপরটি যুবকের–কিন্তু তারপরেও দুটির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য।

নয়

কয়েকদিন পর। দক্ষিণ সুইটজারল্যান্ডের পাসাভাঁ গাঁয়ে লা স্যাল ও পেরিনকে দেখা গেল।

লা স্যাল পেরিনকে নিয়ে এসেছে বললে ভুল হবে। সে-ই বরং পেরিনের সঙ্গ ছাড়বে না বলে তার পিছু পিছু এসেছে। ব্র্যান্ডেনবুর্গের ব্যবসার দায়িত্ব কর্মচারীদের ওপর ছেড়ে এসেছে। কতদিন লাগবে তার ফিরতে বলা দায়। ফ্রান্সের সিংহাসনে আসীন সেই তেলের পিপেটিকে ও আসলে একটা জবর ধাক্কা দিতে চায়।

এখন দেখা যাক, নিয়তি কদ্দূর সাহায্য করে। ভাগ্য বিরূপ না হলে হয়তো পেরিনসহ গোটা ফরাসি জাতি বেঁচে যেতে পারে।

পেরিনকে ইতোমধ্যে হাত করে ফেলেছে লা স্যাল। ডফিনের সঙ্গে ওর মুখের চেহারার মিল এতটাই যে কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। আর কিছু কিছু অমিল তো থাকবেই। এবং আছেও। পেরিনের নাক উঁচু, ডফিনের ছিল বোঁচা। এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চালিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু কানের কি হবে? ডফিনের মত ছোট-বড় দু'আকারের কানওয়ালা লোক কোথায় পাবে লা স্যাল? কাজেই ও চিন্তা বাদ। কার অত বড় বুকের পাটা যে রাজসিংহাসন দাবিদারের লম্বা চুল সরিয়ে কানের মাপ নেবে?

পেরিন গোটা ব্যাপারটা আত্মস্থ করতে সময় নেয়নি। নকল রাজা সাজতে হবে তাকে। ধরা পড়ে গেলে পালাতে হবে। আর পালাতে না পারলে মারা পড়বে। ব্যস, এই তো। এর বেশি কিছু তো নয়। কেন, সে মরার ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে যায়নি? তবে? এখানেও না হয় ঝুঁকিটা নিল সে।

ননডর্ফের কাছ থেকে দলিলপত্র উদ্ধার করা যায়নি। ফলে, এ ছাড়া আর গতিই বা কি বেচারীর? তবে কিসের দলিল ছিল ওগুলো আজও কিন্তু জানতে পারেনি লা স্যাল। ওর কাছে গোমর ফাঁস করেনি পেরিন।

ও নিয়ে আর মাথাও ঘামায় না লা স্যাল। সে পেরিনকে রাজি করাতে পেরেই খুশি। পেরিন পাসাভাঁয় তার মামা, মামী, মামাতো বোনের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিক, তারপর ওর সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে ফ্রান্সের পথে।

পাসাভাঁয় এসে লা স্যাল বুঝল, সিংহাসনের চাইতে কম লোভনীয় জিনিস পেরিন ত্যাগ করছে না। মামা-মামীর পুত্রসন্তান নেই। ও তাঁদের চোখের মণি। একমাত্র মামাতো বোনটি, জাস্টিন যার নাম, অনিন্দ্যসুন্দরী। মেয়েটি যে পেরিনের প্রতি কতটা অনুরক্ত তা লা স্যালের অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই ধরে ফেলে।

পেরিনকে দেখামাত্র এক দাসী চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিস, মিস, কে এসেছে দেখো। মাস্টার চার্লস এসেছে!'

আর জাস্টিন প্রায় উড়ে এসে 'চার্লি' 'চার্লি' বলে পেরিনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লা স্যাল জীবনযুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষ। তার বুঝতে বাকি থাকেনি পেরিন ইচ্ছা করলেই জাস্টিনকে বিয়ে করে এই বিশাল খামারটির মালিকানা পেয়ে যেতে পারে।

ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করার মধ্যে গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু পাসাভাঁর এই বাড়িতে যে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতির স্বর্গরাজ্য তৈরি হয়ে আছে পেরিনের জন্যে–তার কাছে সে আকর্ষণ নিতান্তই তুচ্ছ।

কিন্তু তারপরও ফ্রান্স কি এক অমোঘ আকর্ষণে টানছে পেরিনকে। বলে রাখা ভাল, পেরিনের নাম আসলে চার্লস ডেসলিস। অপুত্রক মামা পুত্রস্থানীয় চার্লসকে নিজের পেরিন উপাধি দান করেছেন। যা হোক, মামা এখুনি কন্যা সম্প্রদান সহ পেরিনকে সমস্ত বিষয়-আশয় বুঝিয়ে দিতে রাজি। কিন্তু দ্বিধায় ভুগছে স্বয়ং চার্লস ডেসলিস পেরিনই। ফ্রান্সের প্রতি দুর্নিবার টান অনুভব করছে সে।

'মামা,' জাস্টিনের উপস্থিতিতে বার কয়েক বলেছে সে, 'আমাকে একবারের জন্যে হলেও প্যারিসে যেতে হবে। ভীষণ দরকার। এই ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি

তাঁর সাথে যাব। চিন্তা করবেন না, বেশিদিন থাকব না। না গেলে যে ওয়াদা ভঙ্গ হয়ে যায়।'

ফোঁস করে ওঠে জাস্টিন।

'ওয়াদা? আর আমার কাছে যে ওয়াদা করেছিলে তার বেলায়? না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

চার্লস কি আর বলবে, চুপ করে থাকে। অবশেষে মামা এগিয়ে আসেন তার সাহায্যে।

'চার্লস যেমন চায় তাই হবে,' বললেন তিনি। 'ওর কোন ইচ্ছায় কখনও বাধা দিইনি আমি। তোমরাও দিয়ো না। আল্লাহ চান তো ও আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। আর যদি একান্তই না আসে তবে ভাগ্যকে আমাদের মেনে নিতে হবে।' গলা ধরে এল বৃদ্ধের।

লা স্যাল মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল চার্লস ডেসলিসের প্রতি। যুবক ইচ্ছা করলেই রাজ্যসমেত রাজকন্যা পেতে পারে। কিন্তু যেহেতু কথা দিয়েছে লা স্যালকে, তাই কথা রক্ষা করার জন্যে তার সাথে ফ্রান্সে মরতে যেতেও রাজি। এমন লোকের ওপরই তো ভরসা রাখা যায়।

লা স্যাল নিজেকেই প্রশ্ন করেছে, সে হলে কি পারত চার্লসের মত নিরাপদ–আরামদায়ক জীবন ত্যাগ করে অমন মারাত্মক বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে? জবাবটা কিন্তু খুঁজে পায়নি।

যাক, সে সব কথা। লা স্যাল এবাড়িতে আসার পর থেকে একটা জিনিস লক্ষ করছে। সেটা হলো, সম্পর্কে ভাগ্নে হলেও চার্লসের প্রতি পেরিনের ব্যবহারে অদ্ভুত এক সমীহ আবিষ্কার করেছে সে।

কি এর কারণ? ভাগ্নেকে অসম্ভব ভালবাসেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু ভালবাসলেই কি মানুষ ভাগ্নের কোন কথার প্রতিবাদ করে না?

বেশ কয়েকবারই জাস্টিনের কান্নাকাটির ফলে যাত্রার দিন পিছিয়ে দিতে হলো। রাতে লা স্যাল গিয়ে ঢোকে চার্লসের কামরায়, তাকে পই-পই করে বোঝায় আগামীকালই রওনা দিতে হবে। চার্লসকে রাজিও করিয়ে ফেলে। কিন্তু পরদিন নাস্তার টেবিলে বসলেই সব ভেস্তে যায়। লা স্যাল খেতে এসে শোনে আজ আর যাওয়া হচ্ছে না। কেন? না, জাস্টিন যেতে দিচ্ছে না।

'কালকে কোন কথা শুনব না, ঠিক বেরিয়ে পড়ব দেখো,' প্রবোধ দেয় চার্লস।

কিন্তু এভাবে বারবার ক'বার? শেষমেশ জাস্টিনকে মন শক্ত করতেই হলো। ওদের বাসার গাড়িই লেক লেম্যান অবধি পৌঁছে দিয়ে এল লা স্যাল ও চার্লসকে। হ্রদ পেরনোর সময় চার্লস মাথা নিচু করে সারাক্ষণ পানির তলায় কি যেন দেখবার

চেষ্টা করে গেল।

'কি দেখছ অত মন দিয়ে, চার্লি?'

মাথা যেমন ছিল তেমনি নোয়ানোই রইল চার্লসের।

'দেখছি যার ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছি সেই সপ্তদশ লুই এই পানির তলে সত্যিই আছে কিনা। তার কঙ্কালটা থাকলেও দেখতে পাব।'

তাজ্জব কথা তো, অবাক হয়ে ভাবল লা স্যাল। যা হোক, ওপারে পৌঁছে গেল ওরা। আর পৌঁছনোর সাথে সাথে চার্লস এমন আচরণ করতে লাগল, এ পথ যেন তার বহুদিনের চেনা। লা স্যাল প্রশ্ন না করে আর থাকতে পারল না।

'এ রাস্তা দিয়ে তুমি কখনও ফ্রান্সে এসেছিলে নাকি?'

প্রশ্নটা শুনে সোজাসুজি লা স্যালের চোখে চোখে তাকাল চার্লস।

'তুমি জাতিস্মরে বিশ্বাস করো? আমার মনে হচ্ছে পূর্বজন্মে আমি এখান দিয়ে গেছি–'

সাত দিন পর। ডিউক অভ অট্রান্টোর পল্লীভবনে লা স্যালকে দেখা গেল। ক্লেরি নদীর তীরে ফেরিয়ার্স গ্রামে এই পল্লীভবনটি।

চার্লসকে আজ সঙ্গে আনেনি লা স্যাল। তবে কাছে পিঠেই রেখে এসেছে। গাঁয়ের ও মাথায় ছোট এক হোটেল–'অবার্জ দ্য লিলিজ'। সেখানে একটা ঘর ভাড়া করে চার্লসকে তুলেছে ও।

এই ডিউক অভ অট্রান্টোর ওপর অগাধ আস্থা লা স্যালের। কেন? জানতে হলে ডিউকের অতীত দিনের কথা খোলসা করতে হবে।

বিশ বছর আগে এঁর নাম ছিল সিটিজেন ফোকে। চালোঁর শাসক ছিলেন বিপ্লবী সরকারের অধীনে। এই ফোকেই কায়দা করে কুখ্যাত একনায়ক রোবেসপিয়েরকে গিলোটিনে পাঠিয়েছিলেন। তারও আগে সিটিজেন ফোকে ছিলেন অধ্যাপক ফোকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে উদয় হওয়ার পর, সাদরে টেনে নিয়েছিলেন ফোকেকে। তিনি বিপ্লবী সরকারের আমলে পুলিস বিভাগে ছিলেন, নেপোলিয়নের আমলেও সেই একই দফতরে রয়ে গেলেন। তবে নেপোলিয়ন শুধু পুলিস বিভাগেরই নয়, প্রশাসনেরও অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন ডিউক অট্রান্টোর ওপর।

নেপোলিয়ন যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, ডিউক অট্রান্টো একান্ত অনুগতভাবে তাঁর সেবা করে গেছেন। কিন্তু তাঁর পতনের পর?

ডিউকের তখন একমাত্র চেষ্টা ছিল কিভাবে অষ্টাদশ লুইকে ফিরিয়ে আনা যায়। এবং ফিরিয়ে তিনি আনলেনও। তেলের পিপে এসে জাঁকিয়ে বসলেন

ফ্রান্সের সিংহাসনে। ফোকে একা নয়, দেশের লোকও আশা করেছিল রাজা এবার তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দান করবেন।

কিন্তু কিসের কি। অষ্টাদশ লুই কৃতজ্ঞতার ধার ধারেন না। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটাকে তিনি দুর্বলতা মনে করেন। ডিউক অভ ব্ল্যাকাস উপাধি দিয়ে রাজা তাঁর প্রবাসজীবনের সহচর শিভালিয়ার দ্য কোপালাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। আর অট্রান্টোর ঠাঁই হলো না এমনকি মন্ত্রীসভাতেও। রাগে-দুঃখে রাজধানী ত্যাগ করলেন অট্রান্টো। চলে এলেন নিজ গাঁয়ের পল্লীভবনে।

তবে তাঁর পল্লীভবনটি টুইলারি প্রাসাদের চাইতে কিছু কম নয়। নেপোলিয়নের মনটা ছিল উদার। যাকে দান করেছেন তাকে একেবারে রাজাতুল্য করে তবে ছেড়েছেন। অট্রান্টোর কি পরিমাণ টাকা আর সম্পত্তি রয়েছে তিনি নিজেও জানেন কিনা সন্দেহ।

অষ্টাদশ লুইয়ের প্রতি অট্রান্টো যে বিরূপ সেটি জানতে বাকি নেই লা স্যালের, অট্রান্টো যে রাজাকে সরিয়ে দিতে চাইবেন এ ব্যাপারেও সে নিঃসন্দেহ। আর কুমড়োপটাশটা সরে গেলে সপ্তদশ লুই ছাড়া সিংহাসনের জোরাল দাবিদার আর আছেই বা কে?

আসল-নকল নিয়ে তেমন সমস্যা হবে না। চেহারার মিল তো রয়েছেই। তাছাড়া, ডফিনের ছেলেবেলার কথা চার্লসকে পাখিপড়া করে শিখিয়েছে লা স্যাল।

রাজপরিবারের জীবিত সদস্যদের মধ্যে একমাত্র ম্যাডাম রয়েল ডফিনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত। ষোড়শ লুইয়ের কন্যা মেরি থেরেস হচ্ছে এই ম্যাডাম রয়েল। ডফিন পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে কড়া পাহারার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয় ফ্রান্সে। তারপর অস্ট্রিয়ায় তাঁর মামার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মামার ইতোমধ্যে মৃত্যু ঘটে গেছে। ক্ষমতায় আছেন মামাতো ভাই। এই মামাতো ভাই তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন ম্যাডাম রয়েলের। উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রান্সের সিংহাসনের ওপর নিজেদের বংশের দাবি তৈরি করে রাখা। কিন্তু ম্যাডাম রয়েল সে বিয়েতে মত দিলেন না। ফলে, ভিয়েনার প্রাসাদ তাঁর জন্যে রীতিমত কণ্টকময় হয়ে উঠল। তিনি ইংল্যান্ডে চলে গেলেন চাচা অষ্টাদশ লুইয়ের কাছে। চাচার সাথেই ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন তিনি, এবং রাজদরবারে তাঁর খানিকটা প্রভাবও রয়েছে। বড্ড একরোখা আর নির্মম মনের মানুষ ম্যাডাম রয়েল। এতে অবশ্য কেউ আশ্চর্য হয় না। কেননা, শৈশবে টেম্পল কারাগারে তাঁকে যে লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, মনের ওপর তার একটা প্রভাব না থেকে পারে?

এখন কথা হচ্ছে, এই ম্যাডাম রয়েল হয়তো ধরে ফেলতে পারেন যে, সপ্তদশ লুই নামধারী ব্যক্তিটি আসল নয়–জাল। সেক্ষেত্রে চার্লসকেও জুতসই

জবাব দিতে হবে। তাকে বলতে হবে, সিংহাসনের লোভে ম্যাডাম এধরনের কথা বলছেন। কেননা, অষ্টাদশ লুই নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুর পর ম্যাডাম রয়েল ক্ষমতারোহণের স্বপ্ন দেখছেন। আর সেজন্যেই আসলকে নকল বানাবার চেষ্টা করছেন।

ম্যাডাম রয়েলকে আশা করা যায় সামলানো যাবে।

লা স্যালের প্রস্তাব শুনে অট্রান্টো ভাবনায় ডুবে গেলেন।

'আরও ভাবতে হবে,' অবশেষে বললেন তিনি। 'কাল সকালেই আমার জবাব পৌঁছে যাবে অবার্জ দ্য লিলিজে।' একথা বলার পর হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'লিলি হচ্ছে ফ্রান্সের রাজাদের রাজপ্রতীক। সেই লিলিফুলের হোটেলে যখন তোমার দোস্ত উঠেছে, তখন কপাল খুলতেও পারে।'

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে লা স্যাল ও পেরিন, প্রকাণ্ড এক অশ্বযানের শব্দে চমকে উঠল। কালো কাঠের আচ্ছাদন ওটার, সোনার কাজ করা। দরজার ওপর ডিউকের মুকুট আঁকা স্বর্ণফলক জ্বলজ্বল করছে। কুচকুচে কালো চার ঘোড়ায় টানা গাড়িটা হোটেলের দরজায় এসে থামল।

কোচোয়ানের পাশ থেকে নেমে এল উর্দি পরা এক দূত। একটু পরে লা স্যালের হাতে তুলে দিল একখানা চিরকুট। খামে ডিউকের মুকুটের ছাপ।

চিঠি পড়ে জানা গেল, অট্রান্টো লা স্যালের সঙ্গীকে অতিথি হিসেবে তাঁর প্রাসাদে আশা করছেন। তাঁর ধারণা, এ হোটেলে কষ্ট হচ্ছে চার্লসের।

চার্লস রীতিমত দ্বিধায় পড়ে গেল। একবার বাইরে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে তাকায়, আর একবার নিজের পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর নজর বুলায়। এই পোশাকে ওই গাড়িতে চাপা যায়? ব্যাপারটা হাস্যকর নয়? এখন অবশ্য লোকজন কম, বেশি কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু নামার সময় ডিউকের বাড়ির লোকেরা তো দেখবে। কি ভাববে তারা?

লা স্যাল চার্লসের ইতস্তত ভাবটুকু ধরতে পেরেছে। মুচকি হেসে নিজের ঘরে চলে গেল সে। একটু পরে মোটাসোটা একটা কাপড়ের ব্যাগ হাতে ফিরে এল। ব্যাগটা আগেও লক্ষ করেছে চার্লস, কিন্তু কি আছে ওটার ভেতরে জানার কোন আগ্রহ বোধ করেনি। যাক সে কথা, এমুহূর্তে ব্যাগটার ভেতর থেকে বেরোল এক প্রস্থ জমকাল পোশাক। লা স্যাল কিনে রেখেছিল চার্লসের জন্যে।

'আগে খেয়ে নাও, তারপর পোশাক পোরো,' বলল লা স্যাল। 'আর তোমার উদ্ধার কাহিনী এবং গত বিশ বছরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে গল্প ওদের বলবে, সেটা একবার ঝালাই করে নাও।'

'লেক লেম্যানে নৌকাডুবির পরের ঘটনা ডোলার সম্ভাবনা নেই। তবে আপনি চাইলে তার আগের ঘটনা একবার শোনাতে পারি।'

'শোনাও, তাই শোনাও,' উৎসাহ জোগায় লা স্যাল।

টেম্পল কারাগার থেকে এক দুর্যোগের রাতে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার পাওয়া, মিউডনে বাস করা থেকে শুরু করে, পথে গোয়েন্দা পুলিসের ধাওয়া খাওয়া এবং সব শেষে লেক লেম্যানে নৌকাডুবি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বর্ণনা করে গেল চার্লস। ডিউককে বলবে, এসব ঘটনার কিছু সে শুনেছে লা স্যালের কাছে, কিছু ব্যারন ইনেজের কাছে।

ও যতক্ষণ বর্ণনা করল লা স্যাল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে গেল।

'বিশ বছর পর লা স্যালের সাথে আবার দেখা হলো ব্র্যান্ডেনবুর্গে,' বলে শেষ করল চার্লস।

লা স্যাল এবার সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'গল্পের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে চিন্তা নেই,' বলল ও। 'ওটা তো তোমার নিজের অভিজ্ঞতা। কিন্তু চিন্তা ছিল প্রথম অংশটুকু নিয়ে। একবার ঝালিয়ে নেয়াতে ভালই হলো। যাকগে, ডিউকের গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, এবার যাওয়া যাক।'

ডিউকের গাড়ি ওদের নিতে এসেছে দেখে সরাইয়ের মালিক কী সম্মানটাই না দেখাল! অথচ এখানে ওরা যখন ওঠে তখন এর দশ ভাগের এক ভাগও দেখায়নি

লা স্যাল বিল মেটানোর পর উদার হাতে বখসিসও দিল। ডিউকের গাড়ি, ঘোড়ার একটা ইজ্জত আছে না?

খানিক পরেই ডিউকের প্রাসাদের সামনে এসে গাড়ি থামল। উর্দিপরা ভৃত্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের সর্দার দৌড়ে এল দরজা খোলার জন্যে। প্রাসাদের গোল বারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। ডিউক অট্রান্টোকে প্রশস্ত মর্মর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল। লা স্যাল বলে দিয়েছিল, ফলে চার্লস গাড়ি থেকে নামেনি। ডিউক নিজে তাকে হাত ধরে নামালেন।

রাজার সামনে ছাড়া কেউ নতজানু হয় না। তাই অট্রান্টো সবার সামনে কি করে এক ভুঁইফোঁড় আগন্তুককে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানান? তবে শরীর নুইয়ে সম্মান জানালেন তিনি।

'মহামান্য, আমার এই প্রাসাদ, বন্ধু-বান্ধব আর ভৃত্যদের আপনি নিজের বলে মনে করলে কৃতার্থ হব।' নিঃসঙ্কোচে বললেন।

চার্লস কিন্তু যা বলল নিজে থেকেই বলল। লা স্যাল ওকে শিখিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়নি।

'ধন্যবাদ,' শান্ত, গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'আমার বিশ্বাস, নিজেকে আমি এ সৌজন্যের যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারব।'

দারুণ জবাব! সত্যিকার সপ্তদশ লুইও কি এর চাইতে যোগ্য উত্তর দিতে পারত? মনে হয় না।

ডিউক তাঁর অতিথিকে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। দোতলায় চার্লসের জন্যে আলাদা একটা মহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকগুলো কামরা। রাজোচিত সৌন্দর্যে সাজানো। অতিথির সেবার জন্যে ছ'জন ভৃত্যকে নিয়োগ করেছেন ডিউক। তাদেরকে প্রাসাদের অন্য কোন কাজে ডাকা হবে না।

এছাড়াও দুটো তেজী ঘোড়া বরাদ্দ করা হয়েছে অতিথির জন্যে। প্রাসাদের একশো একর সীমানার মধ্যে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারবে চার্লস। চলে যেতে পারবে ক্লেরি নদীর পাড়ে কিংবা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে। মোট কথা, তার সুখের দিকে প্রাসাদের সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।

'তা, মহামান্য সপ্তদশ লুইকে ইদানীং কোন্ নামে ডাকা হচ্ছে?' ডিউক এক দিন প্রশ্ন রাখেন লা স্যালের কাছে।

প্রশ্নটার মধ্যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ রয়েছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি লা স্যাল।

'চার্লস ডেসলিস পেরিন,' সহজ গলায় উত্তর দেয়। 'বর্তমানে পেরিন হলেন ওঁর আশ্রয়দাতা। আর হ্রদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর যাঁর হেফাজতে কিছুদিন ছিলেন তাঁর নাম ডেসলিস।'

'পেরিন নামটা একেবারেই গেঁয়ো। ওটা বাদ দেয়াই ভাল। ডেসলিসের মধ্যে খানিকটা অভিজাত-অভিজাত ভাব আছে। ওঁকে আপাতত চার্লস ডেসলিস নামেই ডাকা হোক, মানে যদ্দিন পর্যন্ত না সপ্তদশ লুই নামে উপস্থাপন করতে পারছি।'

ডিউক চার্লসের মুখ থেকে গত বিশ বছরের সমস্ত ঘটনা জেনে নিয়েছেন। লা স্যালের সঙ্গে বিশ বছর আগে বিচ্ছেদের পর ওর জীবনে যা ঘটে গেছে তা সংক্ষেপে এরকম:

ইনেজ আর সে তো স্টেজকোচে চেপে নিরাপদে পৌঁছে যায় জেনেভাতে। কিন্তু আকাশ তখন ভারী। যে কোন মুহূর্তে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ভয় পেলেন না ইনেজ। কালক্ষেপণ করে আবার বিপদে পড়তে চান না তিনি। একবার তো পুলিসের হাতে ধরা পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচেছেন। লা স্যাল ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ওঁদেরকে স্টেজকোচে তুলে দিয়েছিল! উঁহুঁ, আর কোন ঝুঁকি নয়। পুলিস জেনেভা পর্যন্ত যে তাঁদেরকে ধাওয়া করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্য বাজ বলে দিয়েছিলেন, হ্রদ পেরোবার কাজটা লেবাসের মাধ্যমে করানোই ভাল। তিনি বহু বছর ধরে আছেন এখানে, বিশ্বাসী মাঝি-মাল্লা বেছে দিতে পারবেন। লেবাস জেনেভায় বসবাসকারী এক ফরাসি ঘড়ি ব্যবসায়ী। রাজতন্ত্রীদের তিনি চিরদিনই সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে পারলে আর চিন্তা করতে হবে না, বাকি পথটুকু তাঁরা

মসৃণভাবে পেরিয়ে যেতে পারবেন।

ইনেজ লেবাসের সঙ্গে দেখা করলেন। লেবাস চাইলেন তখুনি রাজপুত্রকে হ্রদ পার করে দেবেন। কারণ, তিনিও জানেন ফরাসি পুলিস জেনেভা পর্যন্ত ধাওয়া করবে। প্রায়ই ওরা সীমান্তের এপারে এসে লোক ধরে নিয়ে যায়।

ঝড়ের ভয়? এই বিপদের মুহূর্তে ঝড়ের কথা ভাবলে কি চলে? তাছাড়া লেবাস অভিজ্ঞ মাঝি-মাল্লাদেরই তো দেবেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। নৌকায় চড়ে বসলেন ইনেজ ও চার্লস। তবে বিদায়ের আগে ইনেজ ও লেবাস তাড়াহুড়ো করে কিসব চিঠিপত্র লেখালেখি করলেন চার্লস তা বুঝতে পারেনি। পরে অবশ্য জেনেও ছিল, বুঝেও ছিল।

লেবাস ওঁদের নৌকায় তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে গেলেন। ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর।

নৌকা ছাড়ার পরপরই ঝড় উঠল। নৌকা যত এগোয় ঝড়ের তাণ্ডব ততই বাড়ে। আশপাশের নৌকাগুলোরও ডুবু-ডুবু অবস্থা। চোখের সামনে দু'একটাকে ডুবতেও দেখা গেল। কিন্তু চার্লসদের নৌকা কোনমতে তীরের কাছাকাছি এসে পৌঁছল।

কথায় আছে না, তীরে এসে তরী ডোবা–ঠিক তাই-ই ঘটল ওদের কপালে। নৌকাডুবির পর ইনেজ কোথায় ভেসে গেলেন চার্লস দেখতে পেল না। সে একখানা দাঁড় হাতের কাছে পেয়ে আঁকড়ে ধরে। ওটাকে অবলম্বন করে, ঢেউয়ের ধাক্কায়-ধাক্কায় অবশেষে তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

তীরের কাছেই ছিল এক গির্জা। ওটার যাজক-দু'চারজন লোক নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, কোন সৌভাগ্যবান যদি তীরে এসে উঠতে পারে, তাকে তুলে এনে সেবা-শুশ্রূষা করবেন। চার্লস তাঁর কাছেই আশ্রয় পেল। কূলে লুটিয়ে যখন পড়ে তখন অচেতন সে।

ওর জ্ঞান ফিরল পরদিন দুপুর নাগাদ। কিন্তু ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না। কোন্ ফাঁকে নিজের আসল পরিচয় ফাঁস করে দিল যাজকের কাছে।

যাজক ভদ্রলোক বিপন্ন রাজপুত্রকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করলেন। কিন্তু তাই বলে রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইলেন না। ছেলেটিকে তিনি জেনেভায় লেবাসের কাছে পৌঁছে দেবেন স্থির করলেন। তারপর যা করার লেবাসই করবেন।

রাতের বেলা চার্লসকে নিয়ে তিনি হ্রদ পেরোলেন। হ্রদ তখন অনেকটাই শান্ত, কোন বিপদ-আপদ ঘটল না।

রাজপুত্রকে দেখে প্রমাদ গুণলেন লেবাস। কারণ, ডেমারেত পৌঁছে গেছে জেনেভায়। রাজপুত্রকে এক মুহূর্তও তাঁর নিজের বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়

যাজককে শপথ করালেন তিনি যাতে মুখ বন্ধ রাখেন। তারপর তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় দিলেন, এবং চার্লসকে নিয়ে নিজেও রওনা হয়ে গেলেন অজানার উদ্দেশে।

লা স্যাল এঘটনার পর ইনেজের সঙ্গে দেখা করতে লেবাসের বাড়িতে যায়। কিন্তু ভৃত্য তাকে লেবাসের কোন খোঁজ দিতে পারেনি, তিনি কোথায় গেছেন বলতে পারেনি।

এতটাই সতর্ক ছিলেন লেবাস, কাউকে বিশ্বাস করে গন্তব্য স্থানের নাম ফাঁস করেননি। ডেমারেতকে তিনি যমের মত ভয় পেতেন।

লেবাস চার্লসকে এক প্রত্যন্ত গাঁয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর এক শ্যালকের বাসা এখানে। সেই শ্যালকই ডেসলিস।

জেনেভায় ফেরার আগে চার্লসকে এক গোছা কাগজ দিয়ে গেলেন লেবাস। ছোট্ট এক হাতবাক্সে রক্ষিত ছিল সেগুলো। দুটো বিবৃতি ছিল তার মধ্যে। একটি লেবাসের, অপরটি ইনেজের। দুটি বিবৃতিতেই চার্লসের আসল পরিচয় ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। লেবাস চার্লসকে বারবার হুঁশিয়ার করেন, কাগজগুলো যাতে সযত্নে রক্ষা করে সে।

লেবাসের সঙ্গে চার্লসের সেই শেষ দেখা। এর কিছুদিন পরই তিনি মারা যান। তবে এটা বিপদের সবে শুরু। কেননা, এর কাছাকাছি সময়ে ওর আশ্রয়দাতা ডেসলিসও মারা যান। মারা যাওয়ার আগ দিয়ে ডেসলিস তাঁর ভগ্নীপতি পেরিনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন চার্লসকে—পাসাভাঁয়।

পেরিন দম্পতির আদরে-ভালাবাসায় দীর্ঘ দিন সেখানে কেটে যায় চার্লসের। তারপর মাত্র বছর দুয়েক আগে প্রুশীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাড়ি ত্যাগ করে সে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, কিছুদিন পরই গুরুতর আহত হয়। প্রাণে বাঁচা দায়, এরকম অবস্থায় ফ্র্যাঙ্কফুর্টের সামরিক হাসপাতালে নিজের মূল্যবান কাগজপত্র পাশের খাটিয়ার রোগীর কাছে গচ্ছিত রাখে। সেই রোগীটিই ননডর্ফ।

তারপর তো ননডর্ফ খালাস পেয়ে ব্র্যান্ডেনবুর্গে চলে গেল। চার্লস ছাড়া পেল পাক্কা ছয় মাস পর। ননডর্ফের দেয়া ঠিকানায় গিয়ে পৌছল দু'দিন দেরি করে। ইতোমধ্যে ননডর্ফ জাল মুদ্রা চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং আদালতে চালান হয়ে যায়। চার্লস আদালতে গিয়ে শোনে একটু আগেই ননডর্ফকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আদালত প্রাঙ্গণেই ওর পরিচয় হয় লা স্যালের সঙ্গে।

পুরোটা কাহিনী মন দিয়ে শুনে গেলেন ডিউক অট্রান্টো। তাঁর হাব-ভাব দেখে বোঝা গেল না অবিশ্বাস করেছেন কিনা।

'গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য তো?' পরে লা স্যাল প্রশ্ন করে তাঁকে।

'পুরোপুরি। একবারও মনে হয় না বানানো,' জবাব দেন ডিউক। 'আর যদি

বানানো হয়েও থাকে, তবে বলতেই হবে ছেলেটির কল্পনাশক্তি প্রবল। কেননা, গল্পের কোথাও কোন গোঁজামিল পেলাম না।'

'তারমানে আপনি বিশ্বাস করেছেন?' লা স্যাল সোজাসুজি জবাব চাইল।

ডিউকের মুখের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল।

'একবার ডেমারতকে পাঠিয়েছিলাম রাজপুত্রকে ধরে নিয়ে আসতে। আর এবার পাঠিয়েছি তাঁর গল্পের সত্যতা যাচাই করতে। সেবারে তো পারেনি, দেখি এবার পারে কিনা। আগে তার জবাব শুনি, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।'

এদিকে চার্লসের খাতির ক্রমেই বেড়ে চলেছে ডিউকের প্রাসাদে। আশপাশের অভিজাত পরিবারগুলোকে ঘন-ঘন দাওয়াত দেয়া হচ্ছে নানা উপলক্ষে। মূল উদ্দেশ্য, চার্লসকে তাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেয়া। চার্লস ডেসলিস যে ছদ্মনাম ধারণ করে রয়েছে, আসলে যে সে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ আভাসে-ইঙ্গিতে সে কথাটাও জানিয়ে দিচ্ছেন ডিউক।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সারা গেছে। ডিউক এবার কূটনৈতিক চাল চাললেন। পল্লীভবন ছেড়ে চলে এলেন প্যারিসের অট্রান্টো হোটেলে। তাঁর এই প্রাসাদটিও বিশাল। ফেরিয়ার্সে চালু করা খেলাটা এখানেও জারি রাখলেন ডিউক। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে আনতে লাগলেন অট্রান্টো ভবনে, পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন ছদ্মবেশী সপ্তদশ লুইয়ের সঙ্গে।

আবার একদিন সেই পুরানো কথা পাড়ল লা স্যাল।

'আপনার আচরণ দেখে তো মনে হয় চার্লসকে আপনি সপ্তদশ লুই বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাসের প্রশ্ন উঠলে ডেমারেতের জন্যে অপেক্ষা করতে বলেন।'

ডিউক গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেলে। বিশ্বাস করাটা কি খুব বেশি জরুরী? আমাদের উদ্দেশ্য রামকুমড়োটাকে সরানো। এই ছোকরাকে দিয়ে যদি কাজ হাসিল হয়, হোক না ওর চোদ্দ গুষ্টি গ্রামের চাষা, আমি ওকে হাজার বার রাজা বলে সেলাম করব।'

ইতোমধ্যে কিন্তু কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। লোকে বলাবলি করছে সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী সপ্তদশ লুই ফিরে এসেছেন।

চার্লস এখন প্রাসাদের সীমানা পেরিয়ে বাইরেও বেরোচ্ছে। তেজী আরবী ঘোড়ায় চেপে সে প্যারিসের রাজপথ দাপিয়ে বেড়ায়। ফ্রান্সের মুকুটহীন সম্রাট বলা যায় তাকে। তার পরনে থাকে জমকাল রাজোচিত পোশাক, পেছনে অশ্বারোহী সশস্ত্র পাহারাদার। তাদের পরনে অট্রান্টোর দেয়া উর্দি, ফলে কে কি

বলবে? আইনরক্ষীদের মুখে তালা।

একদিন তো চরম ঘটনা ঘটে গেল। রাজধানীর সেরা বিনোদন ভবন হলো অপেরা প্যারি। প্যারিসে বসবাসরত এমন কোন অভিজাত পরিবার নেই যারা সন্ধ্যা কাটাতে অপেরা প্যারিতে না যায়। চার্লস ডেসলিসও একদিন গিয়ে হাজির হলো ওখানে। মঞ্চ সাজিয়ে রেখেছিলেন ডিউক। চার্লস প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে না ঢুকতেই নতমস্তকে উঠে দাঁড়াল হাজার-হাজার দর্শক। চার্লস নিজের বক্সে বসা না পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকল তারা।

একমাত্র রাজাই তাঁর নাগরিকদের কাছ থেকে এতবড় সম্মান পেয়ে থাকেন।

নড়েচড়ে বসল এবার তেলের পিপের দরবার। খবর তারা আগেই পেয়েছিল। কিন্তু রাজা নিজেই যেখানে অপদার্থ, মন্ত্রী-সেনাপতিরা আর কতই বা কর্তব্যপরায়ণ হবে! কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না।

ব্ল্যাকাস তাঁর প্রভুর সঙ্গে জরুরী আলোচনায় বসলেন। এসময় তাঁদের দু'জনেরই দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করে দিলেন ম্যাডাম রয়েল, অষ্টাদশ লুইয়ের ভাতিজী, ষোড়শ লুইয়ের কন্যা। স্বার্থ তাঁরও আছে। রামকুমড়োটা মরলে তিনিই হতেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অথচ এখন কোত্থেকে একটা উটকো ঝামেলা এসে জুটেছে!

ম্যাডাম রয়েল রাজা ও তাঁর মন্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন।

'আপনারা কোন চিন্তা করবেন না,' বললেন তিনি। 'ফ্রান্সের রাজা হওয়া এতই সহজ? এমন কিছু গোপন ব্যাপার ছিল, যা আমি আর আমার ভাই ছাড়া অন্য কেউ জানত না। এখন যে কেউ একজন নিজেকে সপ্তদশ লুই বলে দাবি করলেই হলো? এই ছোকরা কিছুই বলতে পারবে না দেখবেন। সবার সামনে আমি ওর মুখোশ খুলে দেব। আমি আজই অট্রান্টো ভবনে যাচ্ছি। বেঈমান ডিউক-কাউন্টগুলোর মুখে যদি চুনকালি না মাখাই তো আমি রাজকন্যা নই।'

কাকতালীয়ভাবে, অট্রান্টোভবনে সেদিন অভিজাত ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন ঘটেছে। দামি পোশাক গায়ে চড়িয়ে চার্লস বসেছে সবচাইতে উচ্চাসনে, তার ডানে-বাঁয়ে-কাছে-দূরে সারি বেঁধে বসেছেন জেনারেল ড্যাভুট, মার্শাল নে, ডাচেস ক্যাস্টিলনফোকেয়ার ও তাঁর সুন্দরী কন্যা পলিন, ব্যাঙ্কার ওভেরার্ড ও আরও অনেকে।

ইতোমধ্যে ডাচেস তাঁর মেয়ের সঙ্গে চার্লসের বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেছেন ডিউকের কাছে। আজ, এ মুহূর্তে সভায় চলছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। সপ্তদশ লুই অচিরে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করতে চলেছেন। ঘোষণার সঙ্গে যুগপৎভাবে তাঁর সমর্থনে সামরিক অভ্যুত্থানও চাই। সে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে

জেনারেল ড্যাভুটকে। রাজধানীর বিশ মাইলের মধ্যে তাঁর সেনাবাহিনী তাঁবু ফেলে অবস্থান নিয়েছে। বিশেষ একটি দিনে, গভীর রাতে সেই বাহিনী টুইলারি প্রাসাদ দখল করে নেবে। বন্দী করা হবে অষ্টাদশ লুইকে।

ভোর হতে না হতে ঘোষণা করা হবে সপ্তদশ লুইয়ের সিংহাসন প্রাপ্তির খবর। সে সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীসভার পরিচয়ও জানিয়ে দেয়া হবে।

কে কোন্ বিভাগের মন্ত্রীত্ব পাবেন তাও মোটামুটি স্থির হয়ে রয়েছে। অর্থনীতির জাদুকর নামে পরিচিত ব্যাঙ্কার ওভেরার্ড হবেন অর্থমন্ত্রী। মার্শাল নে পাবেন সামরিক বিভাগের মন্ত্রীত্ব। টালিরান্ডকে সবাই একযোগে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে ইচ্ছুক। তাঁর চাইতে যোগ্য ব্যক্তি গোটা ইউরোপে নেই।

ডিউক অট্রান্টো অবশ্য দ্বিমত পোষণ করলেন।

'যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই,' বললেন তিনি। 'কিন্তু তিনি সুবিধাবাদী লোক। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেন না। আমি অন্য আরেকজনের নাম প্রস্তাব করতে চাই। তাঁর কর্মদক্ষতা আর কূটনীতি আমাকে বিস্মিত করেছে। আমাদের নতুন রাজার একান্ত ঘনিষ্ঠ তিনি, তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পেলে–' কথা শেষ না করে লা স্যালের দিকে আঙুল ইশারা করলেন তিনি। সে তখন হবু রাজার ঠিক পেছনে বসা। 'মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স দ্য লা স্যাল সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। টেম্পল কারাগার থেকে ডফিনকে তিনিই উদ্ধার করেন।'

সবার সবিস্ময় দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো লা স্যালের ওপর।

লা স্যাল মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও পরক্ষণে সামলে উঠল।

'আমি কোন পদ পাই বা না পাই রাজার প্রতি আনুগত্য অটুট থাকবে।'

অনেকেই সাধুবাদ জানালেন একথা শুনে।

ঠিক সেসময় দরজা খুলে প্রতিহারী জানাল: 'মহামান্যা ম্যাডাম রয়েল, ডাচেস আঙ্গুলেম, মেরি থেরেস–'

শুধু যে অপ্রত্যাশিত তাই-ই নয় সবার জন্যে অস্বস্তিকরও বটে। কিন্তু কি আর করা, ম্যাডাম রয়েল স্বয়ং যখন হাজির হয়ে গেছেন, কার এতবড় বুকের পাটা আটকাবে তাঁকে!

ম্যাডাম রয়েল যখন কামরায় প্রবেশ করলেন, ডিউক তখনও তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াতে পারেননি। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তিনি, একখানা আসন এগিয়ে দিলেন তাঁর উদ্দেশে।

'আমি সম্মানিত বোধ করছি, রাজভগ্নী,' নিরুত্তাপ তাঁর কণ্ঠ।

'রাজভগ্নী মানে?' মাডাম রয়েলের কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধ। 'বলুন রাজকন্যা!'

'আগে তা-ই ছিলেন, কিন্তু এখন রাজভগ্নী। কারণ ফ্রান্সের যিনি অধিপতি,

তিনি আপনার ভাই, মহারাজ সপ্তদশ লুই, ওই দেখুন আপনার সামনেই বসে আছেন।'

রাগে ফুঁসে উঠলেন ম্যাডাম রয়েল।

'বাজে কথা বলার আর জায়গা পান না। কোত্থেকে একটা রাস্তার লোক ধরে আনলেই হলো! আমার ভাই আমার সাথে টেম্পল কারাগারে বন্দী ছিল। সেখানে আমার সামনে অসুখে ভুগে সে মারা যায়। বিপ্লবী সরকার তাকে কবরও দেয়। সে কবর এখনও আছে।'

ডিউক নিজেকে সংযত রাখলেও তাঁর কথার মধ্যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ফুটে বেরোল।

'কবর আছে, কিন্তু দেশের জনগণ বারবার কবর খুঁড়ে কঙ্কাল পরীক্ষা করতে বললেও আপনার চাচা রাজি হননি।'

রাজকন্যা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

'কবর খুঁড়তে ধর্মীয় নিষেধ আছে,' বললেন।

'ধর্মীয় রীতি মেনে কি নকল ছেলেটিকে কবর দেয়া হয়েছিল?' তির্যক হাসি ডিউকের ঠোঁটের কোণে। 'বিপ্লবীরা ধর্মের ধার ধারত না। লাশটা আপনারা পরীক্ষা করুন না করুন আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী কবর দিলে ছেলেটার আত্মা অন্তত শান্তি পেত।'

ম্যাডাম আর তর্ক চালিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। তিনি এবার অগ্নিদৃষ্টি হানলেন চার্লসের প্রতি।

'এই প্রতারকটার জারিজুরি আমি এখনই ফাঁস করে দেব।'

সবাই চমকে তাকালেন তাঁর দিকে।

'আমি এমন একটা কথা তুলতে পারি যেটা আমরা দু'ভাই-বোন ছাড়া আর কেউ জানত না, তখনই ও ধরা পড়ে যাবে। অবশ্য তাতেই যে আপনাদের বিশ্বাস হবে ও জাল, তা বলছি না। কেননা, আপনারা তো জেনেশুনেই ওকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।'

ড্যাভুট একথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

'আপনি চাইলে আমাদের রাজদ্রোহী বলতে পারেন, কিন্তু প্রতারণাকে সমর্থন করছি একথা বলে অপমান করতে পারেন না। সে আপনি রাজপরিবারের মেয়ে হোন আর যে-ই হোন।'

ম্যাডাম রয়েল খেপে উঠে কিছু একটা বলতে যাবেন, এসময় হস্তক্ষেপ করল চার্লস স্বয়ং।

'বোন, তুমি এখানে খামোকাই এসেছ। তুমি আমি কথা কাটাকাটি করলে কারোরই কোন লাভ হবে না। বরঞ্চ রাজরক্তকে অসম্মান করা হবে। আমি যে

জবাবই দেব তুমি সেটা মানবে না–ভুল বলে উড়িয়ে দেবে। কেননা, আমাকে জাল প্রমাণ করতে পারলে তোমার লাভ। চাচার বয়স হয়েছে, তিনি আর কয়দিন? আমাকে খারিজ করে দিতে পারলে সিংহাসন তো তোমার, তাই না? কাজেই তুমি সত্যি কথা বলতে পারো না। তুমি খাঁটি মন নিয়ে এখানে এসেছ কেউ বিশ্বাস করবে না।'

লা স্যাল এই বক্তব্য শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। চাষীর ঘরে প্রতিপালিত, প্রায় মূর্খ এক যুবক এত সুন্দর করে কথা বলে কিভাবে? সে-ই তো একে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে সিংহাসনে বসানোর জন্যে, এ তো আদতে লুই চার্লস নয়!

চার্লসের দিকে দ্বিতীয়বার ভ্রূক্ষেপ করলেন না ম্যাডাম।

'এই যুবক যে সপ্তদশ লুই তার কি প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা?' ডিউক অট্রান্টোর উদ্দেশে বললেন।

প্রশ্নটা অভিজাতদেরও অনেকেই করেছেন ডিউককে। জবাবে ডিউক বলেছেন, সময় হলেই প্রমাণ দেবেন। এখন দেখা যাক ম্যাডাম রয়েলকে তিনি কি বলেন।

ডিউকের দু'চোখ আধবোজা হয়ে এসেছে। অনেকটা আপন মনেই তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার কাছে দুই প্রস্থ কাগজ আছে। আমি যখন পুলিসমন্ত্রী ছিলাম তখন থেকে আছে এক প্রস্থ। আর দ্বিতীয় প্রস্থ হাতে পেয়েছি আজ দুপুরে। দুটোর বক্তব্যই হুবহু এক, ম্যাডাম রয়েল। সামনে বসা ওই সম্মানিত যুবকই যে মহারাজ ষোড়শ লুইয়ের একমাত্র পুত্র লুই চার্লস সেটা প্রমাণ করাই কাগজ দুটোর উদ্দেশ্য।'

কামরায় পিনপতন নিস্তব্ধতা। লোকজন যেন শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে।

ডিউক অট্রান্টো বলে চলেছেন: 'দুটি কাগজ দু'জনের বিবৃতি। জেনেভার ঘড়িওয়ালা লেবাসের একখানা, আর একখানা ব্যারন ফন ইনেজের। দু'জনই বলছেন, এই সম্মানিত যুবকই সপ্তদশ লুই।

'লেবাস তাঁর বিবৃতিটি স্পেনের রাজার কাছে পাঠাচ্ছিলেন, লেক লেম্যানে নৌকাডুবির পরপরই। স্পেনের রাজা ফরাসি রাজবংশের আত্মীয়। ফরাসি বিপ্লবের পর বিপ্লবী সরকারকে অনেকবারই তিনি অনুরোধ করেন, ভফিনকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। সেজন্যে লেবাস তাঁকে জানাতে চান যে রাজপুত্র বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ফ্রান্স পুলিস ঘোড়ার ডাকের চিঠিটি কেড়ে নেয়।

'আমার দপ্তরে ওটা আমি আবিষ্কার করি এবং নিজের কাছে এনে রাখি। দপ্তরে ওটার নকল রেখে দিই। পুলিস বিভাগ ওটা খুঁজলেই পেয়ে যাবে।

'এখন আসি দ্বিতীয় প্রস্থের কথায়। লেবাস এটা নিজেই লুই চার্লসের হাতে

দেন। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের হাসপাতালে লুই চার্লস যখন মরণাপন্ন, তখন ননডর্ফ নামে এক রোগীর কাছে সেগুলো জমা রাখেন। পরে তিনি হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পান, ননডর্ফ তখন জেলে।

'কাগজগুলো তিনি ফেরত আনতে পারেননি। কিন্তু আমি পেরেছি। তার কারণ আমি ঘুষ দিতে পেরেছি। ডেমারেত আজই এগুলো উদ্ধার করে এনে তুলে দিয়েছে আমার হাতে। আমি মিলিয়ে দেখেছি দুটোই এক। এখন যার ইচ্ছে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

টেবিলের দেরাজ থেকে দু'তাড়া কাগজ বের করলেন ডিউক।

উঠে এসে পরীক্ষা করলে ডিউককে অবিশ্বাস করা হয়, নয়তো আগ্রহ হচ্ছিল অনেকেরই।

ম্যাডাম রয়েল পরখ করতে না এলেও গর্জন ছাড়তে ভুল করলেন না।

'চিঠি জাল করা যায়। কিন্তু খোদার ওপর খোদকারি করা যায় না। ডফিনের একটা কান অন্য কানের চাইতে বড় ছিল। সাহস থাকে তো প্রতারক সবাইকে দেখাক দেখি।'

অট্রান্টো মৃদু হাসলেন।

'আমি নিজে ওটা দেখার প্রয়োজন মনে করিনি। কাগজ-গুলোকেই যথেষ্ট মনে করেছি। কিন্তু ম্যাডাম রয়েল যখন বলছেন–'

ডিউক এবার কয়েক পা এগিয়ে এলেন। 'মহারাজ, ক্ষমা করবেন–' এই বলে চার্লসের দু'কানের ওপর থেকে সোনালী চুলের গোছা আলগোছে সরিয়ে দিলেন।

উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখল, একটি কান অন্যটির চাইতে লম্বা ও ভারী।

লা স্যাল মনে মনে অভিশাপ দিল নিজেকে, চার্লসকে সে জাল লোক বলে ভেবে এসেছে এতদিন, একবারও তার মনে হয়নি এ আসল লোক হতে পারে। অথচ হাতের কাছেই সহজ প্রমাণ ছিল!

ম্যাডাম রয়েল কিন্তু হার মানতে নারাজ।

'অস্ত্রোপচার করে কান ছোট-বড় করা সম্ভব,' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 'আর আমার ভাইয়েরই যে শুধু অমন খুঁত ছিল তাই বা কে বলল? না, আমি এখনও বলছি এই যুবক ভণ্ড-প্রতারক।' মুহূর্তের জন্যে বিরতি নিয়ে তিনি আবার শুরু করলেন। 'শোনো, মহারাজ অষ্টাদশ লুইয়ের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি দু'দিন সময় দিয়ে যাচ্ছি–এর মধ্যে তুমি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাবে। এ আদেশ অমান্য করলে তোমার স্থান হবে গিলোটিনে।' এই বলে দ্রুতপায়ে ঘর ত্যাগ করলেন তিনি।

'আমরা আশা করছি, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চাচাকে নিয়ে উনিই চলে

যাবেন,' নির্বিকার কণ্ঠে বললেন ডিউক। সবাই সমর্থন করলেন তাঁর কথায়। এবার ডিনার টেবিলের উদ্দেশে এগোলেন অভ্যাগতরা। সামনে শুভ দিন, সবাই তাঁরা উৎফুল্ল।

কিন্তু সে রাতে হঠাৎই অট্রান্টো ভবনে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল, গোটা বাড়ি তখন ঘুমিয়ে।

ব্যাপারটা কি? ডেমারেত বেরোল জানবার জন্যে।

মিনিট দুয়েক পরে ফিরে এল সে, সোজা গিয়ে ডিউকের ঘরের দরজায় করাঘাত করল।

সেখানে উত্তেজিত কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। এরপর ডিউক চার্লসের দরজায় এসে করাঘাত করলেন।

'একটা দুঃসংবাদ আছে, মহারাজ।'

'কি? কি হয়েছে?' ঘুম জড়িত কণ্ঠে বলল চার্লস। পরক্ষণে দরজা খুলে দিল।

কামরায় প্রবেশ করলেন ডিউক।

'নেপোলিয়ন এলবা থেকে ফিরে এসেছেন। নেমেছেন ফ্রান্সের উপকূলে, গোটা দক্ষিণ-পুব অঞ্চল অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে গেছে তাঁর পক্ষে। প্যারিসে পৌঁছে যাবেন যে কোন মুহূর্তে। আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়, আজ রাতেই আপনার চলে যাওয়া উচিত। ম্যাডাম রয়েল আর রামকুমড়োও আজ রাতেই পালাবেন, কোন সন্দেহ নেই।'

চার্লসের মেরুদণ্ড সহসা সোজা হয়ে গেল।

'পালাব কেন, মার্শাল নে, জেনারেল ড্যাভুট আমাদের দলে থাকতে? ডাকুন তাঁদেরকে। আমরা যুদ্ধ করব নেপোলিয়নের সাথে। নেপোলিয়ন অজেয় নন, আগেও তিনি পরাজিত হয়েছেন। এবারও হবেন। হ্যাঁ, যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চার্লসকে আপাদমস্তক একবার নিরীখ করলেন ডিউক। তারপর বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তা হয় না, মহারাজ। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আপনি নে, ড্যাভুট কাউকেই পাবেন না। এমনকি আমাকেও না। আমরা সবাই সেই মহাপুরুষের সেবক। নেপোলিয়ন না থাকলে গোটা ফ্রান্স আপনার জন্যে জীবন দিত। কিন্তু তিনি যখন এসে পড়েছেন, আপনি একজনকেও সঙ্গে পাবেন না।'

চার্লস আর তর্ক করতে গেল না। লা স্যাল ইতোমধ্যে ডিউকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার দিকে চাইল।

'লা স্যাল, আপনি কি করবেন? পালাবেন নাকি সেবকদের সঙ্গে যোগ দেবেন?'

লা স্যাল মাথা নিচু করে বলল, 'নেপোলিয়ন প্রতিভার কদর করেন। তোমার

ছবি যে এঁকেছিলাম, তাতে ডিউক সহ অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছিলাম। দেখি না, এখানে একবার কপাল ঠুকে।'

'কোন বিপদ-আপদ হলে কিন্তু নির্দ্বিধায় পাসাভাঁতে চলে আসবেন।'

ডিউক এবার বললেন, 'যত টাকা প্রয়োজন নিয়ে যান, মহারাজ।'

'তাহলে ঋণ হিসেবে এক হাজার লিভার দিন। খামারের আয় থেকে ধীরে ধীরে শোধ করে দেব। আর একটা ঘোড়া চাই। পরে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল চার্লস। বেরিয়ে পড়ল পাসাভাঁর উদ্দেশে। মামার স্নেহ, জাস্টিনের গভীর ভালবাসা আর আদিগন্ত শস্যখেতের সবুজ সমারোহ আজ দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে তাকে।

www.doridro.com